পুরির গল্প

ইমরুল হাসান

পুরির গল্প

ইমরুল হাসান

শরীফ আহমদকে

সূচী

৫.	পুরির গল্প
২১.	অমর প্রেম অথবা আমার প্রেম
৪৯.	ছোট শহরের গল্প
৬২.	গল্প-লেখকের স্বপ্ন
৭১.	দঈত আননাহাল
৭৮.	কিছু মায়া রহিয়া গেলো
৯৫.	দুর্গতিনাশিনী
১০২.	নিম তিতা নিশিন্দা তিতা
১১১.	ওয়ার এন্ড পিস
১৪০.	টাইগার
১৪৯.	আমার ফ্রেন্ডের বউ
১৫৪.	মাই ভার্চুয়াল গার্লফ্রেন্ড
১৬৬.	শাহেরজাদী
১৭১.	ফিরে এসো

পুরির গল্প

গল্পটা আসলে পুরির। চা-পুরি-সিঙ্গারার পুরি; সিলআটি পুরি, উৎপলকুমার বসুর পুরি-সিরিজের পুরি কিংবা অন্য আর কিছুই না। খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা এইটা। চূড়ান্ত অসাফল্যের একটা ইতিহাস, না-পারার একটা করুণ অধ্যায়।

তখন আমার বয়স দশ। শৈশব শেষ হচ্ছে প্রায়। একটু একটু কিশোর। পাড়ার মাঠ ছেড়ে রেলের মাঠে যাই মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বাজারে যাই আব্বার সাথে। বাজার শেষে রিকশা করে দিলে একা একা বাসায় ফিরতে পারি। এইরকম সব লক্ষণ। মানে আমি বোঝাতে চাইতেছি যে, আমি তখন আসলে আর শৈশবের ভিতর নাই। কিন্তু আমার সম্পর্কে তখনও নর-নারী ভেদ পুরাপুরি ঘটে নাই। নানুবাড়ি গেলে নানা-নানির সাথে এক বিছানাতেই থাকি। একটা বিহ্বল অবস্থার সূত্রপাতও হয় নাই। তখনও আমি কিশোর হওয়ার যোগ্যতাগুলির ভিতর দিয়া যাওয়া শুরু করি নাই।

তখন আমি পড়ি ক্লাস ফাইভে। পৌরসভার মডেল প্রাইমারী স্কুলে। আমি বলতেছি আশির দশকের মাঝামাঝি একটা সময়ের কথা। ইংলিশ মিডিয়াম তো দূরের কথা, কিন্ডারগার্ডেন স্কুলও তখন চালু হয় নাই সেইখানে। পৌরসভার মধ্যে নামকরা প্রাইমারী স্কুল। পৌরসভার তথা সমস্ত উপজেলার ট্যালেন্টপুল বৃত্তির একটা বড়

অংশ এই স্কুল থেকে আসে। আমাদের আগের ব্যাচে উপজেলার সাতটা ট্যালেন্টপুল বৃত্তির পাঁচটাই এই স্কুলের ছিল। গল্পের এবং স্কুলের সাফল্যের সীমানা এই পর্যন্তই। এরপর থেকে আমার অধ্যায়, ব্যর্থতা আর অসাফল্যের গাঁথা। সেই ইতিহাসের বিবরণটা এবার পেশ করি।

আমি যখন ক্লাস ওয়ান থেকে প্রতিযোগিতার ভিতর যাত্রা শুরু করি, সম্ভবত তখন থেকেই ফার্স্ট হওয়ার প্রতি আমার এক ধরনের ভীতিই বলতে হবে এখন, তা ছিল। কারণ আমি কখনোই ফার্স্ট হতে পারতাম না, বিশেষ করে বার্ষিক পরীক্ষায়। যখন ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টু তে উঠি, ভুল করার সম্ভাবনা আমার খুবই কম ছিল, আম্মা-আব্বা, বিশেষ করে বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। তথাপি আমি তা পারি নাই। কারণ আমার হাতের লেখা যথেষ্ঠ পরিমাণ খারাপ হওয়ায়, একই নম্বর পাওয়ার পরও আমাকে সেকেন্ড ঘোষণা করা হয়। তবে রোল নম্বর আমার ১ থাকে, বি সেকশনে। ক্লাস টু থেকে আমি ফোর্থ হয়ে ক্লাস থ্রিতে উঠি, পরিবারের নানা কটুবাক্য সহ্য করে এবং নিজের দিক থেকে কোনোরকম গ্লানি ও জটিলতা ছাড়াই। থ্রি থেকে ফোর-এ ওঠার সময় আবারও সেকেন্ড হই, নিজের দিক থেকে কোনোরকম গ্লানি ও জটিলতা ছাড়াই। কিন্তু পরিবারে কিছুটা শান্তি আসে এবং পাশাপাশি এই বোধটা দৃঢ় হয় যে, এই ছেলে কখনোই ফার্স্ট হতে পারবে না। কেননা, ফার্স্টের সাথে আমার ব্যবধান ছিল যোজন যোজন। আর ফার্স্টওলাও আমার উপর খুব খুশি এইরকম সেকেন্ড পেয়ে। আর আমিও ঈর্ষান্বিত হইতে পারি নাই। এইরকম খুশি খুশি ফার্স্ট-সেকেন্ড আমার ধারণা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু ট্রাডেজিটা ঘটে তার পরেই। এই কম্পিটিশন না থাকাটা ফার্স্ট-এর পরিবার মানতে

পারে না, একই ঘটনা ক্লাস ফ্লোর-এ ওঠার সময় ঘটলে তারা তাকে নিকটস্থ হাইস্কুলের প্রাইমারী সেকশনে দাখিল করেন, আরো কম্পিটিশন মোকাবিলা করে হাইস্কুলের ভবিষ্যত প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য করে তুলবার আশায়। কিন্তু বিপদ হয় স্কুলের এবং আমার। আমি ফার্স্ট হতে পারি না আর ভালো স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করার মতো মেরিট ছাত্র আর খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু ভয়, যদি আমাকে কাট দেওয়ার প্ল্যান করেন, আমার পরিবার। কিন্তু আমার পরিবারে তখন স্বস্তির হাওয়া, এইবার তো অন্তঃত ফার্স্ট হতে পারবে! কারণ তৃতীয় বা চতুর্থ বলে কাউকে খুঁজে পাওয়া ছিল আরো মুশকিল। কিন্তু যথারীতি আমি ফার্স্ট হতে ব্যর্থ হই, প্রথম সাময়িকী পরীক্ষায়। কারণ তখন উত্থান ঘটে নারীবাদের। দুই দুইজন নারী আমার সাথে ফার্স্ট হওয়ার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। একজন ফার্স্ট এবং একজন থার্ড হন। তারা কম্পিটিশন জাগিয়ে তোলেন। যেহেতু তারা মেয়ে, আমি খুব একটা মাইন্ড করি না, কিন্তু একটু একটু খারাপ লাগে যখন লোকজন বলে যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েদের তলে পড়লি! সম্ভবত তখন থেকেই আমার মধ্যে নারীবাদের প্রতি সহানুভূতি জাগতে শুরু করে, পাল্টা যুক্তি দিতে গিয়ে যে, মেয়েরা কী ছাত্র না! ওরা ফার্স্ট হতে পারবে না কেন? কিন্তু এই যুক্তি আমাকে শান্তি বা স্বস্তি কোনোটাই দিতে পারে না। এর পরিত্রাণ হিসাবে পড়াশোনার চিন্তা খানিকটা স্থগিত রেখে আমি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করতে শুরু করি। মোটা দাগে, পরিস্থিতিটা এইরকম। আর তখনই খবর আসে যে, ইন্টারস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে, উপজেলায়। এই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে আমি দুইটা খেলায় পারদর্শিতা অর্জনের চেষ্টা করি। একটা হচ্ছে একশ মিটার লম্বা দৌড় আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অংক দৌড়। প্রথমটা ব্যাখ্যা করার কিছু নাই। কিন্তু দ্বিতীয়টার নিয়মগুলি

সর্ম্পকে একটু বলি। প্রত্যেক প্রতিযোগীর হাতে একটা খাতা এবং কলম থাকবে। মাঠের মাঝখানটাতে ব্ল্যাক বোর্ডে একটা অংক দেয়া থাকবে। বাঁশি ফু দেয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে দৌড় শুরু করতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে অংকটা দেখে, তার সমাধান করে বাকি মাঠ দৌড় দিয়ে শেষ করতে হবে। যে অংকটা ঠিকভাবে করে সবচেয়ে আগে দৌড়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে, সে ফার্স্ট হবে। মানে, কেউ আগে দৌড় শেষ করতে পারে, কিন্তু অংক ভুল হলে কোনো লাভ নাই। প্রতিযোগিতায় ভালো করার মূল শর্ত দুইটা, ভালো দৌড়াতে হবে এবং দ্রুত অংক করতে জানতে হবে। আমি যেহেতু একটু দৌড়াতেও পারি এবং সেকেন্ড হওয়ার অভ্যাস আছে, আমার জন্য এই খেলায় ভালো করার সব সম্ভাবনাই ছিল। আর সত্যি সত্যি সেটা হয়েছিলও। স্কুলের মধ্যে প্রাকটিস করার সময় দৌড়ে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতে শুরু করি; আর অংক দৌড়ে স্কুলে ফার্স্ট তো আমি হই-ই, কিন্তু সেকেন্ড আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। দেখা যায়, আমি অংক-দৌড় শেষ করে, কল থেকে পানি খেয়ে ফিরে আসার পরও যারা দৌড় শেষ করে আসছে, তাদের অংক পরীক্ষা করে সেকেন্ড নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিটি খেলায় প্রতি স্কুল থেকে দুইজন করে অংশ নিতে পারবে। আমি একশ মিটার লম্বা দৌড় এবং অংক দৌড়-এর প্লেয়ার। কিন্তু আমাদের স্কুল থেকে অংক দৌড়-এর জন্য সেকেন্ড আর কাউকে পাওয়াই গেলো না। তাই আমিই একমাত্র। আমি খুবই খুশি হয়ে উঠি আমার নিজের কিছু করার মতো এই জায়গাটা পেয়ে। ভবিষ্যত সাফল্যের স্বপ্ন দিনে এবং রাতে সবসময় দেখতে শুরু করি। পরিকল্পনা করতে থাকি কী করে আমি আরো দ্রুত দৌড়াতে পারি, দৌড়টা কীভাবে শুরু করবো, অংক করার সময় কোন ভঙ্গিতে বসতে হবে, ইত্যাদি। আর অংক তো আমি পারিই।

ফার্স্ট হই বা সেকেন্ড হই অংক পরীক্ষায় হায়েস্ট মার্কস আমার থাকেই। মেয়েরা এতটা ভালো অংক করা তখনও শেখে নাই। দেখতে দেখতে একসময় প্রতিযোগিতার দিন চলে আসলো। প্রথমে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা হবে, তারপর উপজেলা পর্যায়ের খেলা। আমরা জানতাম যে, পৌরসভার প্রতিযোগিতাটা আমাদের স্কুলেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর ঘটলো না। কারণ আমাদের স্কুলের মাঠটা আবার ঈদগারও মাঠ। খেলাধুলার প্রতিযোগিতা করে সেই মাঠ নষ্ট করা যাবে না। তাই অন্য আরেকটা স্কুল ঠিক করা হলো। যদিও সেই মাঠটা ছোট। আমরা সকাল নয়টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেলাম। সব মিলিয়ে আট দশটা খেলা হবে হয়তো। কিন্তু আমার অন্য কোনো বিষয়েই মনোযোগ নাই। শুধুমাত্র আমার অংশগ্রহণের দুইটি খেলা ছাড়া।

প্রথমে হিট। মানে, বিশ/বাইশ জনের মধ্যে থেকে প্রথম আটজনকে মূল প্রতিযোগীতার জন্য বাছাই করা হবে। গোল-দৌড় আর মোরগের লড়াইয়ের পর একশ মিটার লম্বা দৌড়-এর ডাক পড়লো। হিটে আমি সপ্তম বা অষ্টম হয়ে মূল প্রতিযোগিতার জন্য কোয়ালিফাই করি। হিটের কিছুক্ষণ পরই মূল প্রতিযোগিতা। যথারীতি আটজনের মধ্যে আমি সপ্তম বা অষ্টম হই, তবে দৌড়টা শেষ করি। আমার তেমন কোনো খারাপ লাগে না। তারপরও হেডস্যার এসে সান্ত¡না দেন, এটা কিছু না, অংক দৌড়-এ ফার্স্ট হলেই হবে। আমারও প্ল্যান আসলে ওইটাই। কিন্তু অংক-দৌড় হবে সবার শেষে। দুপুর প্রায় দুইটা। প্রথমে হিট। সেই ক্রুশিয়াল মোমেন্ট। আমিও তৈরী। খাতা আছে, হার্ড কাভারের। বসে হাঁটুতে রেখে লিখতে সুবিধা হবে। কলম আছে দুইটা। হেডস্যার আরেকটা দিলেন। কলমের সমস্যার জন্য

যাতে কোনো ঝামেলা না হয়। লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁশিতে ফুঁ পড়লো। আমি দৌড় দিলাম। আমার আগে আরো দুই তিনজন পৌঁছে গেছে। আমি ঘাবড়াই না। জানি অংকটা ঠিক করতে হবে। অংকটা কঠিন না। আমি পারছি। এর মধ্যেই একজন উঠে দৌড় দিল। তাজ্জব ব্যাপার! এর মধ্যেই হয়ে গেল! আমার আরো কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আর কেউ না গেলেই হয়! আমার হাত কাঁপছে। অংকটা হয়ে আসছে। সময় লাগছে। কিন্তু হয়ে যাবে। হয়ে যাচ্ছে প্রায়। আর এই সময়ই যে ছেলেটা শেষ করে চলে গিয়েছিলো সে আবার দৌড়ে আসছে। আমার অংক করা শেষ। আমি জানি আমার অংকটা ঠিক হয়েছে। এইবার উঠে দৌড় দিই। আমার আগে আর কেউ পৌঁছতে পারে নাই। আমার খাতা জমা দিয়ে দিই। আমার মুখে তৃপ্তির হাসি। এতক্ষণে আরো একজন দুইজন আসতে শুরু করেছে। সেই ছেলেটাও আসছে। অংক চেক করার পর দেখা গেলো অংক ঠিক হয়েছে। তার মানে আমিই ফার্স্ট। তা তো আমি হবোই! এখন শুধু ফাইনালটা বাকি!!

ফাইনাল অংক-দৌড়, কিছুক্ষণ পর। পানি পিপাসা লাগছে। হেডস্যার বললো, বেশি পানি না খেতে। অল্প একটু খেলাম। তারপর লাইন গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন প্রতিযোগী অনেক কম। যে ছেলেটা গতবার আগে দৌড় দিয়েছিল, এবার সে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খেয়াল করলাম। কিন্তু পাত্তা দিলাম না। আবারও সব কিছু তৈরী। বাঁশিতে ফুঁ পড়লো। দৌড় দিলাম। এবারও দুই তিনজনের পরই, অংকের কাছে পৌঁছলাম। কিন্তু আমলে নিলাম না, দৌড়বিদরা সব অংক করতে পারলেই হইতো! এবার অংকটা আগেরটার মতোই। একটু তাড়াতাড়ি করার চেষ্ট করলাম। আমার অংকটা শেষ হয়ে আসছে। শেষ করলাম। একটু চেক করতে করতে উঠে

দাড়াচ্ছি, এমন সময় আমার পাশ থেকে সেই ছেলেটা দৌড় দিল। আমিও দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু তার থেকে একটু পিছনে। আমি বুঝতে পারলাম, কী ঘটেছে। কেন আমি এবারও সেকেন্ড হবো। ফার্স্ট হবো না এইবার আর। আমরা দুইজনই পৌঁছেছি, অংক শেষ করে। ওরটা আগে চেক হচ্ছে। আমি আমার খাতা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এরপর আমারটা চেক হবে। যদি ওর অংকটা এবারও ভুল হয়! কিন্তু সেটা যে হবে না তাও আমি বুঝতে পারছি। ছেলেটা আমার মতোই বা হয়তো আমার চেয়েও ভালো।

প্রথমবার ও বেশি তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করেছিলো। দ্বিতীয়বার সে সেটাকে শুধরে নিয়েছে। স্পিড-এর স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে আমাকে বেছে নিয়েছে। আমি অংক শেষ না করা পর্যন্ত সে সময় নিয়ে তার অংকটা চেক করেছে। আর আমারে ওঠতে দেখেই সে দৌড়টা শুরু করে দিয়েছে। আসলে প্রতিটা খেলাতেই জিততে হলে যোগ্যতার পাশাপাশি কম্পিটিশন-এর মাত্রাটা বোঝাও জরুরি। অংক চেক করার পর রেজাল্ট ঘোষণা করা হলো। ছেলেটা ফার্স্ট হয়েছে। আর আমি আবারও সেকেন্ড। তবে উপজেলার প্রতিযোগিতায় প্রথম দুইজন যাবে। তাই আরেকটা চান্স থাকলো।

সপ্তাহ খানেক পরে, উপজেলার প্রতিযোগিতা। তবে ওইখানে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্কুলগুলি থেকে ছাত্ররা আসবে। যাদের অংক পরীক্ষায় পাশ করতেই জান বেরিয়ে যায়, তারা আবার অংক-দৌড় করবে! তাই ফার্স্ট-সেকেন্ড যা হওয়ার তা পৌরসভার থেকেই হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ের খেলাগুলিতে নাকি অংক-দৌড়ের প্লেয়ারই খুঁজে পাওয়া যায় নাই। একটা ইউনিয়নে নাকি এই খেলাটা বাদই গেছে

প্রতিযোগী না পাওয়ার কারণে। তাই ঐ ছেলেটাই আমার মেইন কম্পিটিটর। মানে ফার্স্ট-সেকেন্ড যেহেতু আমাদের মধ্যে থেকেই হবে, এইবার সেকেন্ড থেকে ফার্স্ট হওয়ার গোল্ডেন চান্স সামনে। হেডস্যারও তার রুমে ডেকে নিয়ে আমাকে একদিন এই বিষয়ে বললেন। বললেন যে, ওই ছেলেটা চালাক আছে। তোর ধারে কাছে ঘেঁষতে দিবি না, উপজেলার খেলায়। তোকে দেখে দেখে ও ফার্স্ট হয়ে গেছে। সাবধান, এই ভুল আর পরে করবি না।'

আমিও বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে। দেখা যাবে। ওর তো যোগ্যতা মনে হয় আমার চাইতে একটু কমই। কারণ ও প্রথমবার অংক ভুল করেছে। আমি তা করি নাই। তার মানে ওর ঝোঁকটা ফার্স্ট হওয়ার ব্যাপারে। ও ফার্স্ট হতে চায়, যে করেই হোক, এর জন্য ও ভুলও করতে পারে। কিন্তু আমার এটা করার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ আমি জানি, অংকটাও ঠিক করতে হবে, ফার্স্ট হতে হলে।

উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতাটা হবে স্টেডিয়াম মাঠে। আমাদের স্কুল থেকে বেশ একটু দূরে। অনেক বড় মাঠ। কোরবানির ঈদে গরুর হাট বসে ঐ মাঠে। আমি সকালে স্কুলে যাবো। স্কুল থেকে হেডস্যারের সাথে স্টেডিয়ামে যাবো। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আব্বা পাঁচ টাকা দিলেন। বিশাল ব্যাপার।

ফটো: ইমরান ফিরদাউস

তখন প্রতিদিন আমি আব্বার কাছ থেকে আটআনা (৫০ পয়সা) করে পেতাম। ৫০ পয়সা একটু কম হলেও চলে, ২৫ পয়সা দামের দুইটা আইসক্রীম খাওয়া যায় বা পাঁচটা ঝাল আলু ১০ পয়সা করে এক একটা বা পঁচিশ পয়সা করে বড়ই বা

জলপাই-এর আচার ইত্যাদি। মানে বেশি খাওয়া যায় না, কিন্তু চলে। আব্বা এই পাঁচ টাকা দেয়ার পর তার ব্যাখ্যা দিলেন। স্টেডিয়াম যেতে আসতে দুই টাকা করে লাগবে, চার টাকা। আর প্রতিযোগিতা শেষ হতে দুপুরের পরও হতে পারে। তাই টিফিনের জন্য এক টাকা। তারপরও পাঁচ টাকা। বিশাল ব্যাপার। আমি খুশীতে রওনা দিই।

স্টেডিয়ামে ঢুকে দেখি হাজার হাজার মানুষ। স্টেডিয়াম থই থই করছে। ঢোকার মুখে জিলাপীর দোকান। এক কোণায় চা বানাচ্ছে। আর ঢুকেই বাঁ দিকের কোণায় পুরি ভাজছে। হোটেলে গেলে বড়রা মিষ্টি বা জিলাপী খাওয়ায়, কিন্তু পুরি খাওয়ায় না। আমি প্ল্যান করলাম আজকে যে করেই হোক পুরি খেয়ে যাবো। আমি হেডস্যারের পিছন পিছন ডানদিকের এক জায়গায় চলে গেলাম। স্যার একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এখান থেকে নড়বি না। অংক-দৌড় শুরু হলে আমি এসে নিয়ে যাবো। আর মাইকে ঘোষণা করবে অংক দৌড়-এর কথা। আমি বসে রইলাম। পুরির কথা চিন্তা করলাম। এত এত মানুষ। আমি দেখতেই লাগলাম। একসময় ঘোষণা হলো একটু পরেই অংক-দৌড় শুরু হবে। যে যে স্কুলের স্যারেরা তাদের প্রতিযোগীদের নিয়ে তৈরি হলেন। যেখান থেকে দৌড়টা শুরু হবে সেখানে যাচ্ছি, হেডস্যারের সাথে। এখানে হিট নাই। একটাই দৌড়। ওইটাই ফাইনাল। গিয়ে দেখি ওই ছেলেটা এসেছে। সে আমার কাছে এসে বললো, পৌরসভা থেকেই ফার্স্ট সেকেন্ড হতে হবে। আমরাই ফার্স্ট সেকেন্ড হবো। আর তুমি তো ভালোই পারো। কোনো সমস্যা হবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে। দেখা যাক না। আমি ওর কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে আরো দুইজনের পরে গিয়ে

দাঁড়ালাম। বাঁশি ফুঁ দিবে। আমিও তৈরী। এইবার আমি ফার্স্ট হবোই। এছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। দৌড় শুরু হলো। এইবার দূরত্বটা অনেক বেশি। অনেক দূরে বোর্ডটা। আমি কয়েকজনের পরে গিয়ে পৌঁছলাম বোর্ডের কাছে। সমস্যা নাই। দৌড়টা মেইন না। অংকটা ঠিকমতো করতে হবে। কিন্তু এ কী! এ তো বিশাল একটা সরল অংক। অনেকগুলি যোগবিয়োগপুরণভাগ। এইটা করতে তো অনেক সময় লাগবে। সময় পার হচ্ছেও। কেউই দৌড় দিচ্ছে না। সবাই অংক করছে। আমার ভয় হচ্ছে অংকটা শেষ পর্যন্ত করতে পারবো তো। ভুল করছি না তো। আবার নতুন করে শুরু করবো নাকি। এই সময় একজন দৌড় দিল। আমি পাত্তা দিলাম না। অংকটা আগে মিলাই। তারপর আরেকজন দৌড় দিল। তারপর সেই ছেলেটা। আমার অংক এখনো শেষই হয়নি। আরো কিছু সময় লাগবে। আরেকটু বাকি। চিৎকার শুনে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি হেডস্যার চিল্লাচ্ছে, দৌড় দে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে শেষ কর। আমারও শেষ হয়ে আসছে অংকটা। হয় নাই মনে হয়। তারপরও দৌড় দিলাম। সাত আটজনের পরে গিয়া দাঁড়াইলাম। একজন একজন করে চেক করা হচ্ছে। প্রথম দুইজনের অংক ভুল। ওই ছেলেটার চেক হচ্ছে। হেডস্যার আমার পাশে এসে অংকটা দেখার চেষ্টা করলেন। আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম, হয়েছে কিনা। স্যার কিছু বলার আগেই আমার খাতা চেকের জন্যে চলে গেলো। এই পর্যন্ত কারোরটাই হয় নাই। আমারটাও ভুল হলো। আমার পিছনে আরো অনেকে। সবারটাই ভুল। এখন স্যারদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলো। কে এই অংকটা দিছে? অংকটা ঠিক আছে কিনা, ইত্যাদি।

হেডস্যার আমাকে এসে বললেন, আগের জায়গাটায় গিয়ে বসতে। প্রতিযোগিতা হয়তো আবার হবে, তখন ডাক দিবেন। বাসায় যাতে না চলে যাই। আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বসে পড়লাম। এবারের দৌড়ের জায়গাটা অনেক বড়। পানি পিপাসা লাগছে। প্রচন্ড রোদ। গরম। ঘামছি বসে বসে। কখন যে ডাকবে আবার। বসা থেকে উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। চারপাশে আরো কত মানুষ। কাউকেই চিনি না। আধঘন্টা। একঘন্টা। দুইঘন্টাও হয়ে যাচ্ছে হয়তো। এইবার হাঁটার সীমানাটা আরেকটু বাড়াইলাম। হঠাৎ মনে পড়লো। আরে! পুরি খেয়ে আসি না কেন! পকেটে তো পাঁচ টাকাই রয়ে গেছে। আমি খুঁজতে খুঁজতে বাম দিকে থেকে ডানদিকে যেতে লাগলাম। মানুষের ভিড়ে হাঁটাও মুশকিল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখলাম ভিড়ের শেষ মাথায় পুরির দোকান। প্রচন্ড রোদে কেরোসিনের চুলাটা চলছে। আশপাশটা নরকের মতো প্রায়। চুলার কড়াইয়ে গরম তেল। এখন সিঙ্গাড়া ভাজা চলছে। পাশে টিনের থালায় বিশাল সাইজের বড় বড় পুরি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম দাম কত। দোকানি বললো এক টাকা। আমি দুইটা কিনলাম। পত্রিকার ছিঁড়া কাগজের ভিতর ভরে দোকানি আমার হাতে দিলো। পুরিগুলি খুব একটা গরম না। একটু ঠান্ডা ঠান্ডাই। বেশ কিছুক্ষণ আগে ভাজা হয়েছে। তারপরও পুরি তো খাচ্ছি। আমার বেশ ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে আমি বড় হয়ে উঠছি। হাঁটতে হাঁটতে পুরি খাচ্ছি। আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। অংক-দৌড়টা তো আর হলো না। অন্তঃত পুরি খাওয়াটা হলো। আমি খেতে খেতে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি। এমনসময় হঠাৎ শুনি মাইকে করে আমার নাম ডাকা হচ্ছে। কী ব্যাপার? আমি আমার আগের জায়গাটায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম। হাঁটতে থাকলাম আরো দ্রুত। দৌড়াচ্ছি রীতিমতো। মানুষের ভিড়ে পারছি না যেতে। এবার দৌড়ই দিলাম।

দৌড়তে দৌড়তে যখন আমার আগের বসে থাকার জায়গাটাতে এলাম তখনও দেখি আরো দূরে সামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে হেডস্যার আমার নাম ধরে বলছেন, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, এই মুহূর্তে এখানে চলে এসো। আর আমার সামনে, আরো দূরে প্রতিযোগিরা বসে অংক করছে। আমি বুঝতে পারছি, এখন আর যাওয়ার কোনো মানে নাই। আমি আর প্রতিযোগিতার ভিতর নাই। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। শেষও হয়ে যাবে একসময়। আমি আর এর ভিতরে নাই। প্রতিযোগিতার বাইরে ছিটকে গেছি আমি! এই প্রতিযোগিতাতে আমি আর প্রতিযোগী নাই! আমি পুরি খাওয়ার জন্যে চলে যাওয়ার সময় দৌড় শুরু হয়ে গেছে। আর আমি মাইকে কথা শুনে দ্রুত দৌড়ে আসতে গিয়ে আমার অর্ধেক খাওয়া পুরিটা কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছি। আমি আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে হেড স্যারের দিকে গেলাম। ততক্ষণে প্রতিযোগিরা অংক শেষ করে দৌড় দিয়েছে। পৌঁছে গেছে শেষ মাথায়। আর আমি হেডস্যারের সামনে। স্যার আমার দিকে তাকাতেও পারছেন না। বললেন শুধু, এত বড় বেকুবিটা করলি!

তারপর গিয়ে একে ওকে ধরার চেষ্টা করলেন। আবার কিছু করা যায় কিনা। দুপুর তিনটা প্রায় তখন। কাউকেই আর রাজি করাতে পারলেন না তিনি। আমাকে বললেন, যা বাসায় চলে যা। কালকে স্কুলে দেখা করিস।

আমি প্রতিযোগীদের পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি। ঐ ছেলেটা এবারও ফার্স্ট হয়েছে। ফার্স্ট হওয়াটা তো খারাপ কিছু না। ভালোই হয়তো। আমার কিছু চিন্তা করতেও ভালো লাগছে না। এতো খারাপ লাগছে। বারাবার ভাবতে লাগলাম,

কেন আমি পুরি খেতে গিয়েছিলাম। ওইটাই সব নষ্টের কারণ। আমি আর জীবনেও পুরি খাবো না। অবশ্য এই ঘটনায় বাসায় তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। মানে একদম কিছুই না। প্রতিযোগিতার ভিতর এইরকমটা যেন ঘটতেই পারে। কিন্তু আমিই মানতে পারছিলাম না। আমি আর কোনোদিনই পুরি খাবো না। এইটাই ভাবতে লাগলাম শুধু। পরের দিন বেশ আগে আগে স্কুলে চলে গেলাম। আমাদের ক্লাসরুমে গিয়ে বসে থাকলাম। হেডস্যারের রুমের সামনে দিয়ে একটু হেঁটে আসলাম। দেখলাম স্যার খুব চিন্তামগ্নভাবে বসে আছেন। আমি তার রুমে ঢুকলাম না। আবার ক্লাসরুমে গিয়ে বসলাম। একটু পরে দপ্তরি এসে বললো, হেডস্যার আপনারে ডাকতাছে। আমি খুব খুব আস্তে আস্তে হেঁটে স্যারের রুমে গেলাম। স্যারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্যার চেয়ার থেকে উঠে বললেন, এইটা তুই একটা কাজ করলি! একটা নিশ্চিত প্রাইজ তুই নষ্ট করে দিলি!' আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যারের দিকে তাকানোর সাহসও হচ্ছে না। আমি জানি এইসবই সত্যি। শালা কেন যে আমি পুরি খেতে গেলাম!

'বেয়াদব কোথাকার!' বলে হেডস্যার বিশাল এক চড় দিলেন আমার গালে। অপমানে না, ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। চোখমুখ অন্ধকার হয়ে আসলো। কিছুক্ষণ পর শুনি স্যার বলছেন, যা এখন। আমি চলে আসলাম, ক্লাসরুমে। আমার চোখ দিয়ে তখনও পানি পড়ছে। একটা মেয়ে চলে আসছে ক্লাসরুমে তখন। শে বিস্ময়াভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হেডস্যার তোমারে চড় দিছে! একদিন ক্লাসে সবাই চিল্লাচিল্লি করতেছিল বইলা সবাইরে পিটাইছিল, কিন্তু আমারে কিছুই করে নাই, বলছিলো, তুই সর! আমি জানি তুই কিছু করিস নাই।

বদমাইশগুলিরে পিটাইয়া নেই! বদমাইশ মানে ক্লাসের মাইয়া আর পোলা বোথা কিন্তু এইবার ঠিকই আছে। আরো কয়েকটা থাপ্পড় দিলেও ঠিকই আছিলো। ভুল তো আমি-ই করছি। শালা, তুমি গেছো পুরি খাইতে!

সারাদিন স্কুলে এইটাই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো যে স্কুলের ক্লাস ফাইভের সবচে ভালো ছাত্রটা হেডস্যারের চড় খাইছে। ক্লাসরুম থেকে শুরু করে টিচারস রুম পর্যন্ত। বেশিরভাগেরই মতে, ঘটনা যা-ই হোক স্যারের চড় দেয়াটা ঠিক হয় নাই, ওর তো আর দোষ নাই, এইরকমটা হইতেই পারে। একজন আপা তো ডেকে নিয়ে একটু সান্ত¡নাও দিয়ে দিলেন, মন খারাপ কইরো না, এরকম হয়ই। আবার অনেকে বললেন, একজন স্যার তো একজন ছাত্রকে চড় দিতেই পারেন। স্যার তো আর এমনিতে রাগ করেন নাই। স্কুলের নিশ্চিত একটা প্রাইজ মিস হলো! এর পক্ষে ও বিপক্ষে এইরকম অনেক মতামত জড়ো হলো। বলা বাহুল্য আমি এই চড় দেয়ার পক্ষে ছিলাম। কারণ, শালা তুমি পুরি খাইতে যাও!

তবে যা-ই হোক। শেষ পর্যন্ত আমি আমার এই পুরি না খাওয়ার পণ-এ অটল থাকতে পারি নাই। এখনো রাস্তায় গরম পুরি দেখলে, কিনে নিয়ে খেতে খেতে বাসায় যাই। এখন পুরির ভ্যারিয়েশন আরো বাড়ছে। ঢাকা শহরে এখন নানারকম পুরি পাওয়া যায়। এখনো আটআনার পুরি পাওয়া যায় মৌচাক মার্কেটে। পাঁচ টাকার বিশাল কিমা পুরি পাওয়া যায় মিরপুরে। আলুপুরি কম পাওয়া যায়। বেশি পাওয়া যায় ডালপুরি। তবে ভিতরে ডাল থাকে না। খালি ময়দার আটি। আর দুই টাকারটার চাইতে এক টাকারটাই ভালো। আমি মাঝে মাঝেই ভাবি, পুরি আর খাবো না শালা।

এইটা অপয়া। এর লোভ আমাকে প্রতিযোগিতা থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও আমি পুরি খেয়েই চলি। ভাবি এই ঘটনার কথা। পরাজয়ের গ্লানির চাইতেও আরো রূঢ় সেই অভিজ্ঞতার কথা। আমার যাবতীয় অ-সাফল্য, না-পারা বেদনা যেন এই পুরি খাওয়ার দৃশ্যের ভিতর দিয়াই বাস্তবিক রূপ পায়।

এপ্রিল, ২০০৭

ফটো: ইমরান ফিরদাউস

অমর প্রেম অথবা আমার প্রেম

কথা ও কাহিনি

এইরম গাদলা দিনে বসে আবার মনে পড়লো লিবার কথা। আসলে এই কাহিনির কোন মাথা-মুন্ডু নাই। আমি যত ভাবি আর বলতে চাই, ততই অবাক হই। কিভাবে

এই কাহিনি বলা যাইতে পারে, যেখানে সমস্ত কিছুই অনির্দিষ্টতা, মনে করে নেয়া অথবা যেখানে অস্তিত্ব এতোটাই বিহ্বল যে চেতনা আর সাড়া দেয় না, সবকিছু এতোটাই ¯পষ্ট এবং ধোঁয়াটেও একইসাথে...ভালোবাসার আসলেই কি কোন বর্নণা সম্ভব আর? এই দ্বিধা কাহিনিটার পরতে পরতে আর মাঝে মাঝে ভাবি এইখানে শুধু পরির্পাশ্বই আছে, কোন ঘটনা আর নাই। তারপরও অব্যক্ততার আরো আছে, থাকে, কত যে কথা! অথচ কথাগুলি কি আর বলতে পারে, যা বলতে চায়। অথবা যে দ্বৈততার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে সময়, শব্দ ও তার নিহিত অর্থগুলি তারা তো অসম্পূর্ণ, ব্যক্তির আড়াল খুঁজে। খুঁজে ভঙ্গিমার প্রশয়, যেন এই করে করেই পার পাওয়া গেলো! কি বলতে বসছি, আর বলছি কি! সবসময় এমনটাই ঘটে। কাহিনিটা আর বলা হয় না। বলার মতো কোন ঘটনাও আসলে নাই। আসলে কোন কাহিনি-ই না, এইটা। কারণ আবার মনেহয় এইটা এখনো ঘটতেছে, প্রতিদিন। কথার ভিতরে জমা কাহিনি কি বাইর হয়া আসতে পারবে আর, অথবা ধরো এই যে কাহিনি, সে কি আর কথার ধার ধারে নাকি! ফাঁপা গহ্বর একটা, জীবনের; তারেই কি প্রেম বলে নাম দিছে লোকে?

বাইনোকুলার

বৃষ্টিতে ঝিরিঝিরি শব্দ। একদম সকাল থিকাই। দুপুরে একটু কমলো কি আবার বিকাল না হইতেই শুরু। এই অবস্থা গত তিন-চাইর দিন। বৃষ্টির উছিলা আর কতো! আজকে তো যাওয়াই লাগে। কি উপায়? শিমার মাথায় বুদ্ধির অভাব নাই। কইলো,

বৃষ্টির দিন সবকিছুই ঝাপসা, একটু দূরের জিনিসই দেখা যায় না, তার উপর সন্ধ্যার আগে যাওয়া যাইবো না; তাই দুইটা জিনিস লাগবো, একটা ছাতি আর একটা বাইনোকুলার। বাইনোকুলার? দুপুর বারোটার সময় বইসা বইসা এই প্ল্যান করতেছি।

বাইনোকুলারটা শিমার দুলাভাই আনছে, এখন ওর হেফাজতে আছে, বিকালবেলা ওইটারে কামে লাগাইতে হইবো। আমার মাথা আর তখন কোন কাজ করে না। ঠিক আছে, এইটাই প্ল্যান। ছাতিও আমি নিতে পারবো না। যেহেতু বাইনোকুলার নিবে শিমা, ছাতি নেওয়ার দায়িত্বও ওর। তিনটা না বাজতেই বৃষ্টি যেন তুফান ছুটাইলো। চারদিক অন্ধকার করা বৃষ্টি! যেন আর থামবেই না। হৃদয় এখন মূঢ়তার চূড়ান্ত। চারটা বাজতে, অন্ধকার কমলো; কিন্তু তেজ আছে একইরকম। দুমদাম বৃষ্টি। পাঁচটার দিকে একটু ঢিমেতাল ধরে আসলো একটু। আর দেরি নাই, শুয়ে শুয়ে এর অপেক্ষায় ছিলাম। অর্ধেক পথ যাইতে গিয়া দেখি ছাতি হাতে শিমাও আসতেছে... হাতে একটা গুটলি পাকানো প্যাকেট... কি এইটা? বাইনোকুলার... দেখা যাইবো তো?

বৃষ্টি আবার শুরু হইছে। দাঁড়াইবারও কোন জায়গা নাই। কই গিয়া একটু দাঁড়াই বা বসি! খাঁড়ির ভিতর আইসা নোঙর করছে কয়েকটা লঞ্চ, যদিও একটু দূরে, কিন্তু তার ডেকের উপরই একটু দাঁড়ানো যাইবো তা না হইলে তো আর কোন উপায় নাই। বৃষ্টির দিন একটা ছাতি লইয়া ঘুরাফিরা করতাছে দুইটা মানুষ, তাঁর বাসার পিছনে, এই দৃশ্য কি চোখে পড়বে না লিবার? শে কি আসবো না তাঁর ছাদের কোণায়? না-দেখার মতো কইরা একটুও কি দেখবো না? আবার শুরু হইছে বৃষ্টি!

এই কমে তো এই বাড়ে৷ ঘাপটি মাইরা বইসা আছি লঞ্চের কেবিনের বাইরের জায়গাটাতে৷ শালার বাইনোকুলার খুইলা চোখে দিয়া দেখি, খালি চোখে যা দেখা যায়, এইটা দিয়া তো তাও চোখে পড়ে না! বারবার কাঁচ মুইছা দেয় শিমা, একবার আমি দেখি, আরেকবার সে, কিন্তু কিছুই দেখি না, শাদা, ঝাপসা সবকিছু হঠাৎ আমার মনে হইলো যেন দুইটা ছায়ামূর্তি ঘুরাফিরা করতেছে ছাদের উপর, হেঁটে হেঁটে আবার ফিরে আসছে, দেখছে আমাদেরকেও, শিমাও দেখলো অস্পষ্ট, কিন্তু ওরা কি ডাকতেছে আমাদেরকে, হাত তুলে কি নাড়লো, বললো কি কিছু... একে তো বৃষ্টি, তার উপর সন্ধ্যা... দিনের শেষ ছায়ায় বামপাশের মূর্তির দিকে নির্নিমেষ তাকায়ে আছি, শে কি কিছু বলতেছে আমারে; বলতেছে কি, চলে আসো; দূরত্ব মহান না, যেখানে সমস্তই ঝাপসা, সেই দূরত্ব পার হয়া আসো!

আমি স্তম্ভিত, বইসা আছি, কালো কালো অন্ধকার তেড়েফুড়ে আসতেছে, লোডশেডিং-এর ম্লান আলোতে, থিক থিক কাদার ভিতর হেঁটে হেঁটে ফিরে যাবো বাসায়৷ চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা পড়ে আসবে৷ তোমার মায়া'র দেশে আমি যাইতে পারবো না, কখনোই!

হয়তো সে আমি বলি নাই

এর আসলে কোন শুরু নাই, যেমন শেষটাও এখনো আমার জানা নাই৷ কিছু শব্দ উচ্চারণের ভূত মাথায় নিয়া রওনা দিছিলাম আর তোমারে যা বলছিলাম, তাও আর

শোনা যায় নাই। কথাগুলাই পইড়া আছে, শব্দ-সম্মোহন এর মতো যার অর্থ-উৎপাদনের কোন ক্ষমতা আর নাই।

সন্ধ্যাবেলা একে তো লোডশেডিং, তার উপর মেঘ করছে ভীষণ, বিদ্যুৎ চমকাইতাছে। তাতে ড্রেনের ময়লা পানিতে বারবার মনে হয় ভাসতেছে লিবা'র মুখ। মনে হচ্ছে গড়াগড়ি যাই। একটু আগে কি কথা তারে বলতে গেছিলাম। আর ফিরা আসছি হতভম্ব হয়া। তারপর দিনমান চেতনা আমার পাকুড় বটের মতন ক্রমশঃ তার শিকড় গাড়তেছে গভীর থেকে গভীরে আর হাওয়া বয় শন শন, বৈশাখের।

মনে হয় তোমার কথা আমি কোনদিন শুনি নাই। এখন তো মনেই পড়ে না, কিরকম ছিল তোমার গলার স্বর? হাস্কি টাইপের, নাকি খুবই ঘরোয়া। যে কথা আমি বলতে গেছি, মনে হইতো তুমি তা শোনো নাই। তাই তোমার নাম নিয়া আমি নিজেরেই বলছি। হয়তো আমিই বলতে পারি নাই। কিরকম যে একটা অস্থিরতা! এইটা হচ্ছে ভাষা আর অ-জ্ঞানতার খেলা!! বলবেন হয়তো মনীষীরা। আমি তাদের দূর থিকা সেলাম জানাই। তারা কতই না চিন্তাশীল, অথচ আমার কোনকিছুই চিন্তা করার ক্ষমতা নাই, ইমোশনের দেয়াল দিয়া আটকানো আমার ভাবনারা। কারণ কোন ভাষার দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করতে রাজি ছিল না এই ডিজায়ার। কেন শে হৃদয় দিয়া হৃদয়েরই কথা শোনে নাই? যেখানে কোন ভাষা নাই, সেখানেই তো ছিল, আমাদের ভালোবাসা!

হলুদ স্কার্ট

এইটা তো সত্যি কথা-ই যে, আমার কেউই শহুরে ছিলাম না। এই কথা শুনলে লিবার হাড্ডি পর্যন্ত জ্বইলা উঠতে পারে। কেননা তাঁর শৈশবকাল শহরের মায়ায় ভরা। পুকুর-পাড় আর সরকারি কলোনির কোয়ার্টারগুলির মতো শান্ত, মধ্যবিত্ত। তার পরিবার কোন এক কারণে হিজরত করে আমাদের মরা বন্দরে। আর তার যে পোশাক চোখে ভাসে এখনো, তার রং হলুদ। সেই পোশাকটা হয়তো কবেই বিলীন! তোমার বয়স আমি ভালোবাসি! কি লাবণ্যময় সেই দিনগুলি। যেমন কাঁটাঝোপের ভিতর হালকা পাতার হলুদ ফুল। এতই নরোম যে, হাতে নিলেই ঘামে ভিজে কুকঁড়াইয়া যায়। আমি চেষ্টা করি, যদি একটু শহুরে হইতে পারতাম আমি। একটু শুদ্ধভাষায় কথা বলা-ই তো। কনফিডেন্স হয়তো বাড়তো তাইলে। হয়তো কথা বলা যাইতো তখন, শুদ্ধ উচ্চারণে বা আরবান টোনে। যেমন রুদ্র বলতে পারে।

সামাজিকতাকেই ছিল ঘৃণা আমার। ছিল নিজেকে আরো কতো ছেঁটে ফেলা যায়, তার উপায় বাইর করা। এর ভিতর থিকাই দেখতাম, তুমি যাও সরিষার ফুল জড়ায়ে শরীরে। শীতের দুপুরে। তাকাইতে তাকাইতে চোখ ব্যথা করে। জেগে থাকার নানান পেরেশানি। অব্যক্ততার কঠিন গোর্য়াতুমি। বাঙ্গালি মাত্রই অবদমনে পারদর্শী। হস্তবিশারদ। ঐদিনও দেখলাম বলছেন একজন। ঠিক আছে, তা-ই সই। আমিও বাঙ্গালি। মরার আগে তাইলে একবার অন্তঃত কই, ভালোবাসি! আর তাতেই সকল

বিপত্তি। মরা তো গেলো না। দুনিয়া উল্টাইলো। বাঙ্গালির পোলা কয় কি! তখন তো এর একটা বিহিত করা লাগে। মন্ত্রণাসভায়, আমিই উহ্য। আর সকলই পেয়, লেহ্য, ইত্যাকার। বমি-ই আসে এখন, যখন চারপাশে দেখি আরো কত কত উদাহারণ ভীড় করে আছে। ভালোবাসার যে সামাজিকতা তার ভিতরই তো হাবুডুবু সারাক্ষণ।

তোমার প্রেমিকসকল

তোমার প্রেমিকদের লিস্ট দিতে গেলে, আঁতকে উঠে মন। মনে হয়, চারপাশের সবাই খালি তোমারেই ভালোবাসে। সন্দেহ ভরা আমার মন। নিঃসন্দেহে সবচে বেশি ঈর্ষা আমি করি, নসাকে। সে তোমার জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করছে। আর আমাদের সমাজে স্যাক্রিফাইসই হইলো লভ্। তাঁর ছিল বিশাল ভক্তকুল, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং যে কোন সময় তোমাদের বাসায় যাওয়ার অবারিত সুযোগ। তারে আমি ঈর্ষা করছি। মনে হইছে, যদি সে তোমারে চায়, তুমি কি কইরা না করবা! এইটা কি সম্ভব? কিন্তু সে এতটাই বোকাচোদা, থরথর কইরা কাঁপলো, এমনকি মনে হয়, আমার চাইতেও বেশি। তার এই থরথর প্রেম তারে আর প্রেমিকই থাকতে দিলো না; তুমি তারে ভাই-ই বানাইলা, প্রেমিক না বানাইয়া।

লারু তো সিল-সাপ্পর মারা তোমার প্রেমিক। মানে সে তোমার প্রেমিক, দুনিয়াতে এইটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। সে যে প্রেমে পড়ছে এবং স্ট্রিকলি মনোগ্যামিক এই ফান্ডা সে ভাঙতে নারাজ। থাকুক না বেচারা, থাকুক তোমার প্রেমিক হিসাবে

উল্লেখিত হইবার মতো তাঁর একমাত্র যোগ্যতা নিয়া। এদেরকে পিছনে ফালাইয়া, তুমি কিনা সাড়া দিলা, ভেদারে! সন্দেহ নাই, সে স্মার্ট। কথা বলে চিবাইয়া চিবাইয়া। আমাদের মফস্বলী টোন তাঁর নাই। সে একটু একটু কইরা সুতা ছাড়ে আর তুমি ভাবো কি না জানি সে জানে, যাদুটোনা! কিন্তু সে তিন নাম্বারেই থাকলো আমার কাছে।

সবচে বাজে যে প্রেমিক ছিল তোমার, সে সাংবাদিক। তোমার নানা কুকীর্তির খবর আমারে দিতো, যেন আমি তোমার প্রেমে না পইড়া যাই। একইসাথে অনেক পাড়াতো বড়বোনের সাথে আমার সম্পর্ক নিয়া কাহিনি বলতো সে তোমার বন্ধুদের যাতে এর ছিঁটাফোটাও যদি পৌছায় তোমার কাছে যাতে তুমি একটা খারাপ মনোভাব নিয়াই থাকতে পারো আমার সম্পর্কে। সে কখনোই তোমার প্রেমে পড়ে নাই, কিন্তু সে তোমার প্রেমিক হিসাবে নিজেরে জাহির করতে চাইতো। তাঁর নাম এইখানে উচ্চারিত হইবার কোন যোগ্যতা সে রাখে নাই। আমি ভাবি, সে তো অন্তঃত তোমার প্রেমেও পড়তে পারতো!

রেললাইনের পাশে গাছগুলি তখনো কৈশোরকাল পার করে নাই

হঠাৎ কইরা একদিন দেখি, রেললাইনের ধারে গাছ লাগানো প্রকল্প শুরু হইছে। যে রেললাইনে বসলে তোমার দালানবাড়ি দেখা যায়। দেখা যায়, দূরের নদী। বাজার-ঘাট। খাঁড়ির পানি। মেথর-পট্টি। সেই রেললাইনে পোতা হইলো গাছের চারা। এরা বড় হইতে হইতে আমরা সবাই সমূলে উৎখাত হয়া যাবো, এই কথা তখন কি আর

ভাবা গেছিল। কচি গাছের চারাগুলিকে তখন ভালোই লাগতো যখন শোঁ শোঁ বাতাসে তারা ঘাড় বাঁকাইয়া দুলতো। অথচ সেইটা ছিল তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার মর্মান্তিক প্রচেষ্টা যেন কোনকিছু তাদেরকে উপড়ে না ফেলে। এই করে করে দিনগুলি পার হইতে লাগলো। পাঠ্যপুস্তকের বোঝাতে চাপা পইড়া বইসা আমি ভাবতাম, শে কি আহা, পড়ছে নাকি ভাবছেই কেবল, এইমতো কচি কচি গাছগুলির মতো, আমরা বড় হয়া যাবো, তখন কে আর আটকাবে আমারে।

অথবা ভাবি, বিশাল অন্ধকারে, পাকুড় হবো, খাঁড়ির কিনারে দাঁড়াইয়া থাকবো, ঝড়ের আগের বাতাসে জানালার পর্দা উড়ে উড়ে গেলে দেখবো, কি মনোযোগ, অথচ পড়তেই পারতেছো না, আমি জানি, আমি জানি... এইমতোন কলরোল উঠে, আর বোকাপাঠার প্রেমকাহিনি ছড়াইতেই থাকে হয়তো পারিপার্শ্বে, কে কে আর জানার বাকি?

এসেছিলে, তবু আসো নাই

কি আর করবো, দেবব্রতের রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনি। সাগর সেন ভালো, সেইটা শোনো। হেমন্তও গাইছে। রাজেশ্বরী দত্ত। ঐ বেটি আবার সুধীন্দ্রনাথের বউ। চিন্তা করো। চিনিময়, চিনিময়; কাদেরীয়া, ওরাও... বন্যার সে কি ঢলঢল কণ্ঠ, পাপিয়া সারোয়ার আর খালেদ খানের বউটা, ও ওতো ভালো গান গায়, ফর্দ হাজির করো... রবিবাবুর হাত থিকা আমাদের প্রেমেরও কি আর নিস্তার নাই!

কেননা লিবা'র বড় বইন গান গায়। রবীন্দ্রনাথের নাম লইলে যে গোষ্ঠীর ভিত্রে এন্ট্রি পাওয়া যায় সেইখানে একটা উভলিঙ্গ বা ক্লীবভাব আছে বলে যাতে কইরা ড্রইংরুম থিকা বেডরুম যাওয়াটা খুবই ইজি। ইন দ্য রিলিমস অফ আওয়ার সেন্সস-এ যেমন গান গাইতে গাইতেই চুদাচুদি করা যায়। যেন আমরা গান-ই গাইতেছি আর তার সাইড এফেক্ট হইলো এই যৌনকর্ম (চুদাচুদি না সে)। আর চুদাচদি তো গান-ই একপ্রকার, বাংলা-সিনেমার কাটপিসের অ্যাসথেটিকসরে না মাইনাও এই কথা বলা যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইউটিলিটি এখন এইটাই - পুরুষ ও নারী তাঁদের যৌনতারে হাইড কইরা ফেলতে পারেন এবং গোপন কোন জায়গাতে গিয়া আবার পুনারিবষ্কারও করতে পারেন; হি হি হি কইরা হাইসা (পরিমিত অবশ্যই) বইলা ফেলতে পারেন; আরে, আমরা তো দেখি, নারী ও পুরুষ!

সেই গোষ্ঠীতে তখন চলে মঞ্চ নাটক, আবৃত্তি অনুষ্ঠান আর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। পারর্ফমার না হও, দর্শক তো হইতে পারে! মনরে ফুসলায় মন। আমার মন রাজি হয় না। কেননা যে প্রেম অমর সে কি কোন কাল্টের সদস্য হইতে পারে? বরং আমাদেরকে নিয়াই কাল্ট তৈরি হয় বা হবে বইলাই ভাবতে পারি আমি মফস্বলী প্রেমিকের মতোই।

আবার রবীন্দ্রনাথ যে কি চ্যাটের বাল এইরকমও ভাবতে ভাবতেও ভাবনারে আটকাইয়া রাখি। লিবা হয়তো গান গায় না, কিন্তু অপছন্দ যে করেই - এইটাও তো শিওর না। এইজন্য কনফিউজড থাকি। বন্ধুরা উনার গান শুনে, ভেড়ার দলে

আমিও ঢুইকা বইসা থাকি। এই শুনতে শুনতে ৫৮টা গান মনে করা গেলো, সময় দিলে হয়তো আরো বেশি মনে করা যাবে, অন্তঃত ১০০ কাছাকাছি যাওয়াটা অস্বাভাবিক না। আমার ধারণা, এর চাইতে বেশি আরো অনেকেই পারবেন। ব্যাপারটা ভালো বা খারাপ এইরকম কিছু না, একটা সোশ্যাল ফ্যাক্ট। কুড়ি বছর পরে ভুইলা যাওয়া যাবে।

তারে মানুষ হিসাবেই এখন পোর্টেট করার টাইম। তারে মানুষ বলামাত্রই দেবতাগুণ আরোপ হইতে থাকে তার উপর। তিনি তাঁর সময়ের চাইতে বাইরের কিছু না এবং সেই পাস্ট একটা টাইমের ঘোস্ট হইয়াই তিনি ছড়াইয়া থাকেন প্রেজেন্ট সোশ্যাল কনটেক্সটে। কারণ আমরা যে মানুষ ভূত ছাড়া সেইটা টের পাওয়া তো পসিবল না।

তাঁর যে ভৌতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি তা আমার প্রেমের উপরও চইলা আসতে চাইলো তার বীজ বর্তমান সময়ের ভিতর লুকানো না। আমি বুঝতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ একজন ব্যক্তি না, একটা ভাবধারা। তাকে আমি গ্রহণই করতে চাই, এর কোন বিকল্প আমার কাছে নাই। কিন্তু নিতে গেলেই দেখা যায় এই নেয়ার ভিতর দিয়াই তিনি অ-কার্যকর হয়া উঠেন যে, তারে মডিফাই করা লাগে, তিনি আর থাকেন না, তার ভাবধারা তবু টিকেই থাকতে চায়! অমরতার এ এক কঠিন বিপত্তি!

আমার প্রেম জানি এইরকম ভূত হয়া কারো ঘাড় না মটকায়। এইটুকই চাইতে পারি আমি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথরে ভালোবাসার মতো যথেষ্ঠ মার্জিত ও ভদ্র আমি কখনোই হইতে পারি নাই এবং লিবা যে তার বড় বোনের মতো গান গাইয়া পাড়া

বেড়াইতো না, তা এক ধরণের শান্তি দিতো আমারে, এক ধরণের ঐক্যবোধ জাগতো, আমার মনে, আমাদের মনে (মানে লিবা আর আমি তখন একই তো ব্যাপার)।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে আর ঘাসগুলি আরো তাজা সবুজ হয়া উঠে। দূরে কোথাও কোন প্রতিকৃতি দেখি, দূরের দিকে তাকাইয়া থাকতে থাকতে, দূরত্বে চোখ বন্ধ হয়া আসে, দিগন্তে, আকাশের ঐপাড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি করুণ ও কালো হইতে হইতে মুছে যাইতে থাকে, লিবা কি তাইলে ঘর-বন্দী? আসবে না আর ছাদে?

ছাদের আড্ডায়

ময়মনসিংহ এখনো দূর কোন পরবাস। যেখানে চলে যাওয়া যাইতো। একটা আড়ালের ভিতর বসে, বহ্মপুত্রের ধারে। কি যে সব ভাবনা! নিজেরে জাহির করা খালি। কত যে কথা। আসলে কোন কথাই আর কথা ছিল না তখন, ছিল নরোম মোলায়েম কোন পাখি। উচ্চারণমাত্রই তারা উড়ে যায়। রাই, তুমি কথা বলো না কেন? এই প্রশ্নে আমার আড়ষ্টতা বাড়ে। বলতে তো চাই আমি। আমি পাখির কথাই বলি। কিন্তু যিনি বলছেন, অবদমনকারী, তার বমিতে ভেসে গিয়ে কোন ভাষা কি আর জন্ম নিতে পারে?

আমরা স্বপ্ন সাজাই। আর কি কি করতে পারি আমরা, আমি ও আমার বন্ধুরা, একটা দমকা হাসির ভিতর দিয়েই উড়িয়ে দিতে পারি সমস্ত সন্দেহ লিবার, একটানা বিকাল থেকে শুরু করে, রাত অবধি। লোডশেডিং এর আধাঁর যখন নামে, চাঁদের ফকফকা আলোতে তখন লিবারে জিগাই, আজ কি পূর্ণিমা? তোমারে এমন সুন্দর লাগতেছে কেন? যদি আমি মরে যাই! যদি আমি বাঁইচা থাকি আর তোমারে না দেখি! এত বিহ্বলতা। এত কাছ থেকে দেখা। তোমার চুল বারবার সরে আসতে চাইছে, ঢেকে দিতে চাইছে তোমার মুখ। তুমি হেসে বারবার সরাইতে চাইছো। তবু তাকাতেই পারছো না। কাঁপতেছে তোমার কণ্ঠ, শব্দ আর কথারা।

বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা চাইছি একটু আড়াল। আর এই এইটুকু ছাদের উপর, বদমাইশগুলাও কোন লুকানোর জায়গা পাইতেছে না। আমাদের আড়াল তো আমরা নিজেরাই। ঝিঁঝিঁ পোকাদের মতো আমরা কথাই বলে যাইতেছি, জোনাকিদের মতো জ্বলতেই আছি। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে থেকে, অন্যদের কথা শুনে শুনে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে, নিজেদের দেখতে দেখতে, কথাগুলি হারাতে লাগলো, যদি পাইতাম কোন আড়াল, ময়মনসিংহে, বহ্মপুত্র তীরে...

মেঘনার বাতাসে সেই আহাজারি, কল্পনাই এখন!

লাল টিনের গুদামঘর

স্বর্গ হইতে বিদায়! ছাদ থিকা নামতে হইলো। আশ্রয় নিলাম লাল টিনের গুদাম ঘরের পাশে। পাশে বস্তি। মাগিপাড়াই এক রকম। কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়া চলে গেছে রাস্তা। ব্রীজের গোড়ায়। সেইখানে পেশাব করা শেষে গিয়ে বসি সন্ধ্যার আড্ডায়। শর্ত একটা অবশ্যই সূর্য ডুবে যেতে হবে। আবছা অন্ধকারে যেন দেখা যায়, শুধু ছায়াগুলাই। ভাবি, এই টিনের ঘরের ভিতর ভূত হবো। সারারাত নেচে-কুঁদে ডর দেখাবো, লিবারে। প্রচন্ড শব্দে জেগে উঠবে শে। ঘুমের ভিতর থেকে। বুঝবে, এই ভূত তার প্রেমিকের। পুরাপুরি লোকাল।

দূরেই যাইতে চাই, অথচ কাছাকাছি এসে বসে থাকি। গ্রাম ছেড়ে দিয়ে গ্রামের মায়ায় শহরের ভিতর গ্রাম পুষে রাখে মানুষ যেমন। ফিরে ফিরে আসি। চলে যাওয়ার ব্যস্ততায় সামাজিক হওয়ার শেষ চেষ্টা চালাই। তোমার চোখের দিকে আর তাকাইতেই পারি না আমি। আর লিবা ভাবে, যেন আমি উদ্ধমুখী কোন বা®প, চায়ের কেটলি থিকা বাইর হয়া যাইতেছি। যখন ফিরা আসি, মনে হয় সে কি মুগ্ধতা! শে কি আমারে ভালোবাসে? প্রশ্ন তো জাগতেই পারে মনে। তাই না? যেহেতু শেও ছলনাময়ী আর আমি সবসময়ই বোকা হইতে রাজি; এমনকি লাল টিনের গুদাম ঘরে গ্রাম থেকে উঠে আসা মফস্বলী ভূত পর্যন্ত!

ক্লাসরুমের বোকা বেঞ্চিগুলা

: তোমার সাথে আমারে আম্মা এই অবস্থায় দেখলে কাইটা মেঘনা নদীতে ফালাইয়া দিবো!

আহ্। বিষয়টা তাইলে আমি বা তুমি না অথবা রাই বা লিবা না, বিষয়টা হইতেছে তোমার আম্মা। তুমি ভালো বাসতেই চাও আমাকে, কেবল তিনি, যে তোমার সিদ্ধান্ত-কর্তা দোষটা শুধু তারই, আর কেউ-ই না! কত যে ভালো লাগলো এই কথা তোমার, এই প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো, এই মুহূর্তেই তোমার হাসিটাকে একটা দমকা দীর্ঘ চুমুতে শেষ করে দিই!

চুপ করে বসে আছি। দরজায় পাহারা দিচ্ছে রুদ্র আর শিমা। আমি জানি, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়াই আসছো। তোমার প্রেমিকের কথাই তুমি ভাবতেছো এখন। এইটা তো বদলানোই যায়, কিন্তু কেন আমি জোর করবো তোমাকে!

কেন তোমার পথই তোমাকে আমার দিকে নিয়ে আসে না?

সিঁড়ির গোড়ায়

: আচ্ছা বলো, কি বলবে তুমি?

: হ্যাঁ, বলবো...

: বলো, তাহলে, তাড়াতাড়ি বলো, কেউ কিন্তু চলে আসবে

: হ্যাঁ, ই-ই-য়ে, মা-নে, মানে আমি আসলে, তুমি তো জানো

লিবা দাঁড়ায়ে আছে দুইটা সিঁড়ি উপরে। আর তার নিচে আমি রাই আরেকটা মানুষেরই মতো দাঁড়াইছি। মনে হয় অনেক অনেক দূর থেকে রাই মুখ তুললো। দেখলো, লিবা সরাসরি তাকায়ে আছে তার চোখে। কৌতুক খেলতেছে তাঁর চোখগুলিতে। চকচক করছে রাতের হাজার তারা। কি সুন্দর তাঁর ঠোট! ঠোঁটও হাসতেছে, ভাঁজ পড়ছে গালে, কি মসৃন তাঁর গালের ত্বক! শে যা জানে বা যা শে শুনতে চাইতেছে বা আমি যা বলতে চাইতেছি... আর কেন রাই বলতে পারতেছে না আটকে আছে আর তোতলাচ্ছে, কছ না শালার ব্যাটা... আর বলতে পারাটা যে কিছুই মিন করে না শেও বুঝতে পারতেছে মনেহয় এইটা

: হ্যাঁ, বাবা জানি, বুঝচ্ছি, উপর থেকে কে যেন আসছে, তুমি যাও!

: হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো কিছু বললা না!!

: ঠিক আছে আমি পরে জানাবো (হাসি) কে জানি আসছে তুমি যাও

: হ্যাঁ, কিন্তু

: কালকে কলেজে দেখা হবে, ক্লাসের শেষে, যাও এখন...

বলেই লিবা উঠে গেলে উপরে।

বন্ধুগণ এতক্ষণ ছিলেন ভেড়ার সঙ্গী। এখন আমিও তাই। শিমার গর্জন, কথা কইচছ তো ঠিক মতো হ, কইছি কী কইলো কালকা দেহা করবো ঠিক আছে, এহন খুশি

তো, মুখ ব্যাজার কেন রাই ভাবতেছিল যে, লিবা কেন এত হাসতেছিলো, কেন?
ছাগল তো ছিলামই, গরুও ছিলাম, এইবার ভেড়া হইলাম,
নির্বিরোধ ফ্রেন্ডশীপের অফার দিবে না তো আবার?

বিচ্যুতি ও বিচ্ছেদ

আমি যে ভুলে যাবো তোমারে, এইটা আর অন্যরকম কিছু না। সন্দেহের দড়িতে বান্ধা যে জীবন, মে বি তার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। একটা সুতা থিকা আরেকটা সুতায়, ঘুরতে ঘুরতে ভাবনার কতদূর পর্যন্ত যে যায়। ভাবনারা খুবই বিপদজনক। আর তার চাইতেও ঘটনাগুলি। তারা ক্রমশঃ দূরতিক্রম্য হইতে থাকে। একটু একটু করে সরে আসা আর একসময় নিজেকে দেখতে পাওয়া খাদের কিনারে।

ভুলে যাওয়া যে, যে কোনকিছুই হারিয়ে যেতে পারে, যে কেউই হারিয়ে যেতে পারে আর এটা এমন একটা বিষয় যে, অনুপস্থিতি ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়া আসে। বিচ্যুতির ভিতর বিচ্যুতিটাই স্বাভাবিক, সেটা আর বিচ্যুতি না কোন। একইভাবে বিচ্ছেদ এরও কোন অন্ত নাই। নিস্তরঙ্গ নদীর জল, শীতের বিকালবেলায়, যেন কোনকিছুই ঘটে নাই কোনদিন।

ডায়েরী যদি লিখা হতো, তাইলে হয়তো লিবা এইরমও লিখতো পারতো

সারা বিকাল ধরে শুধু তার জন্য অপেক্ষা; হয়তো সে চলেই আসতে পারে। ছাদে, ব্যালকনিতে হাওয়াদের লুটোপুটির সাথে ঘুরে ঘুরে, অনেক দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে, যখন সন্ধ্যায় আলোগুলি নিভে এলো দিনের, সবকিছু ভারী হয়ে উঠলো ক্রমশঃ। তারপরও সে হয়তো চলে আসতে পারে, রাতের গুমটি ঘরে ফিরে যাবার আগে হয়তো ছায়া ফেলে চলে যাবে। সামনে রাস্তা, লোডশেডিংয়ের করুণ আলো, ঘিঞ্জি বস্তি, লাল টিনের বিশাল সরকারী গুদামঘর; তখন হয়তো ভূতেরা জেগে উঠবে এইখানে, যখন সে চলে যেতে পারে। একটিই তো মাত্র এই দিনের প্রতীক্ষা, অথচ কত সংশয়, শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে, বারবার পায়চারি করে, উদ্বেগের বিন্দুগুলিকে আরো জ্বলজ্বলে করে তোলা। গাছের পাতাগুলি ঘন হয়ে আরো অন্ধকার ডেকে নিয়ে এলো, এখন সামনে দুইহাত দূরের কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আর সে তো কোন অধ্যায়, অব্যয়ের কাছে নত; ফিরে আসার কথায় কেবলি গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে, কোন দূরে; পিষ্ট চাকার দাগ কাদায়, থলথলে বৃষ্টির জলে, ডুবে যাচ্ছে; অন্য কোন আকার, পরিবর্তিত ও শংকাময়, এইভাবে একদিন হারিয়েই তো যাবে, সে ও তার প্রতিপক্ষ পরিপার্শ্ব। ক্লান্ত, ভাবনারাও থেমে থেমে আসে; যদি সে চলে আসে, যদি সে চলে আসতে পারে!

সকালবেলাটা আরো বিশ্রী, কড়কড়ে রোদের মাঝে গা ব্যাথা নিয়ে জেগে উঠা; তারপর ভয়াবহ শূন্যতায় নিজেকেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। এই শ্বাপদসংকুল অঞ্চলে, যেইখানে পরিচিত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিহ্বল হয়ে আসে

আত্মা; পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে সুদূরের কাছে, যেইখানে হয়তো সে নিরুদ্রুব জীবন-সংসারে বেঁচে আছে, আর আমিও তার ছায়ায় পাশাপাশি। অথচ সেই ইচ্ছেগুলি ঝাঁঝালো রোদ হয়ে দিন বাড়তে থাকার সাথে সাথে উত্তপ্ত হয়ে নিজেদেরই গিলে খায়। একটা গোলকের ভিতর আবারও প্রত্যাবর্তন। যদি আমিই বেরিয়ে আসতে পারতাম, উন্মুখ প্রান্তরের কাছে এসে নত হয়ে পড়ে থাকতে পারতাম; তাহলে সে না-ই আসলো, আমি জগতদাত্রীর এই লীলায় মিশে গিয়ে তাকে ফিরে পেতে পারতাম।

চিঠিগুলি

১.

নিস্তরঙ্গ ঘুমের ভিতর, চিঠির দিনগুলি ফুরিয়ে গেলে আবার, মৃদু পায়ে কারা উঠে
আসে ডাকঘরের বাক্স থেকে ঘরে ঘরে, বিলীয়মান শব্দে, আবারও মুছে যায়;
প্রভাতের আলো আসে জানালা গলে, শীতের নরম দিন, বানর নাচছে সকালে...

২.

জবাব লিখছি তোমার চিঠির
ঘর-সংসারের আরো কত কথা তুমি জানতে চেয়েছো
আমিও এখন বলতে পারি অনেককিছু
যেমন ধরো, এখনো বর্ষার নদী ছড়ায়নি তার আঁচল
সবুজ ধানের ক্ষেত সোনালি হয়ে উঠেনি পেকে আর

নতুন রাস্তার বুকে মাটি জমা করার পর সবে ইট ফেলা হয়েছে
ঢালাইয়ের কাজ শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি চলে আসবে
তোমার রিকশা খানা-খন্দে আটকে বারবার ঢেকুর তুলবে
ওর বারোটা বাজবেই, যদি ওই পথে তোমার চিঠি না এসে তুমিই চলে আসো

দেখবে মলিন হাওয়ারা পাল্টাছে ডানা
কতকিছু থেমে আছে, কতকিছু থেমে নেই
পোস্টকার্ড পাঠিয়ো আরো, সম্ভব হলে
চিঠি লিখবার দিনগুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত

৩.
সেলাই মেশিনে করা ফুল তোলা নকশা পাঠিয়েছো।
বারান্দায় বসে করা, তাই তাতে ফুটেছে নানা আকৃতি, বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল মন।
ফুল আছে তিনটা, লাল রংয়ের, পাতাগুলি সবুজ আর হলুদ সুতায় তোলা।

সেলাইমেশিনে হাত রেখে অনেকসময় কাটলো তোমার
মেঘনাব্রীজ পার হয়ে ট্রেন ছুটে গেলো ষ্টেশনের দিকে।
গাঢ় সেন্টের গন্ধমাখা তোমার রুমাল পোস্টম্যান দিয়ে গেলো

কী লিখবো এর প্রত্যুত্তর, আর কবিতা নয়
তুমি লিখো অনেক দীর্ঘ, দি-ই-র-ঘ আমার চিঠি

প্রত্যাভিক্ষা তোমার!

বহুদিন, অনেকদিন, তারও পরে আরো অনেকদিন পর... একটি বিকেলবেলা

একদিন বিকালবেলায়, লিবা আমারে একটা গল্প শুনাইলো। লিবা বলতেছিলো, একদিন দুপুরবেলা বাসায় শুয়ে শুয়ে রেডিওতে একটা নাটক শুনছিলাম (এককালে রেডিওতেও নাটক প্রচারিত হইতো, ভুইলেন না পাঠক!)। নতুন বিয়ে হয়েছে, এক দম্পতির, তাদের গল্প। দু'জনেই তরুণ। স্বামীটা ভালো চাকরি করে। বউও সুন্দরী। এমন একটা সংসার। কিন্তু কোন একটা কারণে বউটার ভালো লাগে না। মন-মরা থাকে। কারণ স্বামীটা তার সাথে ঠিকমতো কথা বলে না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, কিন্তু বাড়তি কোন কথা নাই। আদর আহ্লাদ নাই; বউটার অস্বস্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। এমন করেই দিন কাটে। দেখতে দেখতে একদিন তাদের সংসারে আসে নতুন অতিথি...

: তোমার কি নাটকের গল্পটা শুনতে ভালো লাগছে না? ...
: না, না বলো, শুনতেছি তো; কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না...
: পুরাটা শুনো তাহলে আগে...

তো ছোট্ট শিশুর আগমনে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরা খুব খুশি হলো। আগে তো বউটা একটা অস্বস্তি নিয়ে থাকতো, হয়তো এবার এটা কেটে যাবে, শে নিজেও এটা ভাবলো। সত্যি সত্যি নতুন জন্ম দেখে, শিশুটিকে দেখে, স্বামীটা খুবই খুশি

হলো। অফিস থেকে ফিরে সারাদিন বাচ্চাটাকে নিয়ে মেতে থাকে। বাচ্চাটার জন্য তার সে কি ভালোবাসা! কখনো একটু কাঁদলে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখে, সারাক্ষণ খেলা করে, এইসব। কিন্তু বউয়ের দিকে তার কোন নজরই নাই। যেন আগের থেকে অনেক কমে গেছে। আগে তো তাও কথা বললে জবাব দিতো, এখন বাচ্চা নিয়ে সে এতই মশগুল যে অনেকসময় খেয়ালই করে না।

যখন এইরকম পরিস্থিতি তখন একদিন বউটা বাচ্চাটাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসলো। তার বাবা-মা জিজ্ঞেস করলো, চলে এলি কেন? তখন শে বললো যে, যে স্বামী তাকে ভালোবাসে না, তার সাথে ঘর করা যায় না। কয়েকদিন পর স্বামী আসলো। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, কেন শে চলে এসছে? বউটা অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। বললো, তুমি আমাকে যখন ভালোবাসো না তখন এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছো? স্বামীটা বললো, কে বলেছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না?... কিন্তু ভালো যে বাসো এই কথা কি কখনো বলেছো?... এই কথা শুনেই স্বামীটা আকাশ থেকে পড়লো, বললো, কেন? ভালো যে বাসি এই কথাটা কি তুমি বুঝতে পারো নাই?... তুমি যদি না-ই বলো আমি বুঝবো কেমন করে? বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো বউটা... তখন স্বামীটা তাকে জড়িয়ে ধরে, কানে কানে বললো, ভালোবাসি, ভালোবাসি...

তো এই হচ্ছে গল্প। এই বলে লিবা সরাসরি তাকালো আমার চোখে। বললো, আর তোমার প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে, তুমি যাকে বিয়ে করবে, তাকে প্রতিদিন না হোক, প্রতি সপ্তাহে না হোক, অন্তঃত মাসে একবার বলো যে, তুমি তাকে

ভালোবাসো। তা নাহলে বেচারা বুঝতেই পারবে না, তুমি তাকে ভালোবাসো কিনা। তারপর, চোখ নামায়া, একটু গলা নিচু করে বললো, এই নাটকটা শোনার পর আমার তোমার কথা মনে হয়েছিল।

আসলে আমি এর কি-ই বা জবাব দিতে পারতাম। নতমুখ চিবাচ্ছি ঘাস, যেন তোমার গলির মুখে দাঁড়ানো কেবলই একটি ছাগল... যে কোন উচ্চারণ মাত্রই অব্যক্ততা, অর্থহীনতা। আমি বুঝতে পারি লিবা আমারে ভালোবাসতে পারে নাই, যদি শে পারতো, হয়তো তারও ভালোই লাগতো এই ভালো না বাসতে পারা ভালোবাসা।

একসময় উঠে আসি মাঠ ছেড়ে আমরা। রাস্তা দিয়া হাঁটি, চারপাশে কতই না মানুষ, কতই না গাড়ি, প্রাইভেট কার, বাস, টেম্পু, রিকশা, এর ভিতর দিয়াই শেষ হলো ভালোবাসার একটা বিকেল।

এইরকম ঘটনা, খুবই অ-পার্থিব একটা ব্যাপার, তাই না? এই যে গল্প বলা, মানে এইটাই তো একমাত্র কথোপকথন এর স্মৃতি। এর আগের দিন যে, লারুরে দেখছিলাম তোমার পাশে বসা, সেইটা এখন আমি ভুইলাই গেছি!

শেষ চিঠি

ভুলে যাবো বলেই লিখেছিলাম একটা চিঠি। সেই চিঠি যার একটা অক্ষরও আমি আর মনে রাখতে চাই নাই। আর সেই প্রতিজ্ঞা এতোটাই সর্বগ্রাসী ছিল যে, এখন চাইলেও তার কোনকিছুই আর মনে করা সম্ভব না। তারচে' একটা উপকথা-ই বলি!

একটা লোক হাঁটতে হাঁটতে তার জীবনের শেষ প্রান্তে চলে আসছে। তখন সামনে সমুদ্র। সূর্যাস্তের আকাশ। বালিতে বসে বসে সে তার জীবনের পার হওয়া পায়ের ছাপগুলি দেখতে পাচ্ছে। সে খুব অবাক হয়ে দেখলো, সারাটা জীবন তাঁর দুইটা পায়ের ছাপের পাশে চলে আসছে আরো দুইটা পায়ের ছাপ। সে অবাক হয়ে খোদাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে খোদা, এইটা কি? সূর্যাস্তের আকাশ বললো, সারা জীবনে তুমি কখনোই একা ছিলে না; সবসময় আমি-ই ছিলাম তোমার পাশে। তখন সে খুব ভালো করে আবারো দেখলো তার জীবনের পার হয়ে আসা পায়ের ছাপগুলি। তখন সে আরো অবাক হয়ে দেখলো, তাঁর জীবনের দুইটা জায়গায় শুধু এক জোড়া পায়ের ছাপ। আর সে দেখলো, ঐ দুইটা সময়ই ছিল তাঁর জীবনের সবচে' কষ্টের সময়, সবচে' বেদনার মুহূর্ত আর তা দেখে সে খুবই কষ্ট পাইলো। বললো, হে খোদা, আমার এইরকম বিপদের দিনে, তুমি কেন আমার পাশে ছিলে না! সূর্যাস্তের আকাশ বললো, আমি তোমার পাশে ছিলাম না, কারণ তখন আমি নিজে তোমার সত্তাকে ধারণ করেছিলাম আমার ভিতর আর তোমাকে

রেখেছিলাম আমার কোলে, যাতে জীবনের এই কষ্টগুলি, বেদনাগুলি তোমাকে গ্রাস করতে না পারে।

এই উপকথা পড়েই আমার মনে হয়েছিল, আসলে হয়তো আমি তোমার প্রেমিক হইতে চাই নাই; চাইছিলাম তোমার ঈশ্বর হইতে আর তোমার কাছে সর্মপিত করতে চাইছিলাম আমার আত্মাকে!

তোমারে দেখছে কেউ

রেলস্টেশনে যখনই আসি, ভাবি দেখা তো আমাদের হয়াও যাইতে পারে! দেখা যে হয় না, এইটা অনেক ভালো একটা ব্যাপার। মনে যে হয়, দেখা তো আমাদের হয়াও যাইতে পারে, এতে কিছুটা বিহ্বলতা আসে, ভাবনা আসে, রাগও লাগে যে কেন এই চিন্তা! রেলষ্টেশন এর পাশে হরির বাড়ি। হরির কথা আর মনে হয় না। মনে হয় যে, সে একদিন তোমারে চিৎকার করে বলতে চাইছিলো, আমার নাম; রররররাইইইইইই...তুমি ধবলা, আমি শ্যাম কই পাই?

এই করে করেই আসলে সময় পার হয়। আমি ভাবি, যদি দেখা হয়; এই চিন্তাটাও যে মাঝে মাঝে আসে, তার আর কোন কারণই নাই। কারণ নাই অথচ ভাবি, উদ্দেশ্য ছাড়া যেমন হাঁটি, ঘুরাফিরা করি। এই যেমন আর ভাবতেই চাই না, থেমে পড়ি। আমি না দেখি, তোমারে তো দেখছে কেউ। তখন খুবই খারাপ লাগে। আমি

কি এতোটাই পাপী? আমার প্রায়শ্চিত্তের আর কি কোন শেষ নাই? এতোটাই দূরে কেন আমি এখন, যেখানে দূরত্ব এক মাইলও না?

শালা, মিলিটারি!

: এর পিছনে কি মিলিটারি আছে নাকি?

: শালার মিলিটারিই তো এই দেশটারে খাইছে।

: মিলিটারির উপর তোর এত ক্ষোভ কেন?

: শালার লিবাও তো একটা মিলিটারিরেই বিয়া করছে। শে চাইতেছিলো একটা নিশ্চিন্ত জীবন।

: ওর হাজব্যান্ড মিলিটারি হইলেও মেইন স্ট্রিমে নাই। সাকসেসফুল হইতে পারে নাই।

: পারে নাই তো কি হইছে। ও তো লিবারে পাইছে!

: ব্যাপারটা কিন্তু এইরকম না। শেষদিকে ওর ফ্যামিলিও রাজি ছিলো না, বরং লিবার ফ্যামালিরই আগ্রহ ছিলো বেশি।

: যা-ই হোক। ব্যাপারটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

: তুই এখনো এইটারে ধইরা রাখচোছ।

: না, আসলে এইরকমও না। আমি যে সবসময় লিব'র কথা ভাবি এইরকমও না। বা কোনসময় যে খুব বেশি মনে হয়, এইরকমও না। এই যেমন তুই কথাডা তুললি তখনই মনে হইলো। মনে হইলে কেমন জানি একটা শূন্যতা লাগে খালি। এর বেশি আর কোনকিছুই না। আসলে ব্যাপারটা বুঝানো যাইবো না। একটা বিশাল হা করা

গর্ত, এইটুকুই... মাহমুদুল হকের গদ্যের লাগান কাব্যময় না, একটা অব্যক্ততা, হাসফাঁস করার মতো, যা থিকা বাইর হওয়া যায় না আর...

: শেষদিকে লিবা তো ওদের বাড়িতে গিয়া বইসা থাকতো, ওর মা-বাপের মন জয় করার লাইগা।

: ঠিক আছে, যা হওয়ার হইছে, বেটির তো বিয়া করা লাগবো, নাকি? তবে যা-ই কছ, মিলিটারিরা আসলে এক একটা বাইনচোত।

: হা হা হা, তুমি আসলেই ক্ষেপছোছ!

: এইখানে না খেইপা কোন উপায় নাই। ওরা তো সব দিক দিয়াই প্রিভিলাইজড। লিবা যদি কোন মিলিটারিরে বিয়া করতে চায় ওর তো কোন দোষ নাই। শে একটা সিকিওরড লাইফই তো চাইছে।

: ভেদারে শে হয়তো পছন্দও করতো, ভালোও বাসতো।

: লিবা'র যদি ভালবাসার কোন বিষয় থাকে, সেইটা শুধুমাত্র আমার সাথেই জড়িত। এর বাইরে তাঁর জীবন আছে, কিন্তু ভালোবাসার কোন বিষয় আছে বইলা আমার মনে হয় না।

: ঠিক আছে, বাপ! ও এমনেতেই বাস্তববাদী ছিল। আর ওর সিদ্ধান্ত তো ভুল কিছু হয় নাই। বিয়ার পরে একটু মোটা হইছে, এই আর কি! এইটা তো তুইও হইছোছ।

: হহ্! এতক্ষণে ভালোবাসা ব্যাপারটার একটু টাচ্ তুই পাইলি!! শালার তরার লাইগাই আমার প্রেমটা হইতে পারে নাই। আমি একলা গেলে ঠিকই পারতাম। সবসময় তরার জ্বালায় আমি তো কোন কথাই কইতে পারতাম না। মজাডা তো তরাই লইচছ।

: তুই শালা, এহনো এইরহমই মনে করিস!

: আমার মনে করা দিয়া কিছু যায় আসে না। বিষয়টার তো একটা শেষ হইছে। আমিও আর লিবা'র কথা ভাবি না। শালার তুই-ই তো মনে করাইলি।

: আমি তো মিলিটারির কথা কইছি। তুই না লিবা'র কথা আনলি।

: শালা, মিলিটারি!!

সময়ের ঢেউ

একটা সার্টেন টাইম পরে নিজেদরকে ভুইলা থাকতে পারাটাই আসলে প্রেম। বালির উপর লিবা'র নাম লিখে বসে আছি, অপেক্ষা করছি সময়ের পরবর্তী ঢেউ কখোন আসবে; মুছে দিবে এই শব্দ, আহাজারি, কথা ও কাহিনিগুলি।

মে, ২০০৮

ছবি: দঈত আননাহাল

ছোট শহরের গল্প

ছোট শহর মানে একজন কবি থাকেন সেইখানে। মানে, একজন কবি থাকবেন বইলাই একটা ছোট শহর এগজিস্ট করে আমাদের দুনিয়াতে। এই কথা আমি বলি নাই, বলছেন জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী ইন্ডিয়া রাষ্ট্রের পশ্চিমবাংলা প্রদেশের, কবি রণজিত দাশ। ইন ফ্যাক্ট উনার বলা লাগে নাই, উনি কবিতাই লিখছেন এইরকম;

এমন পাওয়ারফুল! কিন্তু উনি মনে হয় বড় শহরেই থাকেন, মুম্বাই অথবা দিল্লী। কিন্তু এই কথা সত্যি না হইলেও সমস্যা নাই; এইটা ত গল্প-ই। গবেষণা না। না-জানা দিয়াও গল্প লেখা যাইতে পারে, ধারণা কইরা। আসলে যা যা আমরা জানি খালি তা নিয়াই গল্প লেখার মতো বাজে জিনিস তো আর কিছু হইতে পারে না। উনি ঢাকা শহরেও মনে হয় আইছেন কয়েকবার। কবিদের লিস্ট বানাইছেন এবং কবিরে প্রাবন্ধিক ও অনুবাদকরে কবি হিসাবে চিনছেন, এইরকম। সার্টিফিকেটও নাকি দিছেন, মৌখিক; আর যেইটা লিখিত, তারে কইছেন, সিলেকশন, পরিবর্তনযোগ্য। যদিও পরে কইছেন যে, উনার না-জানা আছে, ধারণা কইরাই দিছেন। এই অর্থে, উনার কবি বাছাইয়ের ঘটনা উনার শারীরিকভাবে বড় শহরে থাকা, না-থাকার মতোই প্রায়।

যা-ই হোক, সেইটা বিষয় না। বিষয় হইলো, ছোট শহর। সেইখানে একজন কবি থাকেন বা না-থাকেন, বেশ কিছু গল্প এবং গল্পকার অবশ্যই আছেন।

সেই কথা মনে হইলো, যখন ছোট শহরের একটা গল্প আমারে একজন (যিনি শব্দের ভিতর দিয়াই সেক্স করতে চান, যেহেতু সেক্স ইজ ইন দ্য ব্রেইন, এইরকম) শুনাইছেন; যে, ছোট শহরে একটা কিশোরী মেয়ে থাকে, শে বাঘের বাচ্চা পালে; একসময় বাঘের বাচ্চাটা বড় হয়া যায়, ছোট শহরে আর আঁটে না, সে তখন কী করে! বড় শহরের জঙ্গল মনে কইরা সেইখানে গিয়া রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা পড়ে! আহারে যদি সে ছোট শহরে থাকতো, তাইলে বড়জোর রিকশার তলে পড়তো, হাত-পা মচকাইতো, ব্যান্ডেজ-বাঁধা শরীর দেইখা আমাদের মনে জাগতো

কামনা, স্যানিটারি প্যাডের কথা মনে কইরা মনে হইতো কিশোর বয়সের ইনসেস্ট মেমোরিগুলা। বাঘের বাচ্চা এবং কিশোরী মেয়ের প্রেম - এই জাতীয় গল্পও লেখা যাইতো হয়তো; আর এই কারণেই ছোট শহর অনেক রোমান্টিক ব্যাপার, তাই না?

আমি কই, হায় হায় আমার জীবন দেখি গল্প হয়া যাইতেছে। দ্রুত গল্প লিখার সিদ্ধান্ত নেই আমি। অথেনটিক ছোট শহরের একটা গল্প, যেইটা আবার গল্প-লেখা নিয়া।

সময় বিকালবেলা। সন ইংরেজী ১৯৮৯। গরমের দিন। বাতাস বইতেছে।

স্থান অবকাশ হোটেল। অবস্থান লঞ্চঘাটের কিনারায়।

একজন মদখোর ও একজন দার্শনিকের আলাপ এবং পরে একজন কবি ও রাজনৈতিক নেতাও যোগ দিবেন। একজন স্কুলশিক্ষকও আসার কথা, তবে নাও আসতে পারেন। শেষ পর্যন্ত, সাংবাদিক আইসা পুরা গল্পটার কন্ট্রোল নিবেন।

টেবিলে চা আসার পরে মদখোর শুরু করেন, 'কিঅ, আমার বাপে নাইলে মদই খা; ইলিগ্গা হে এইডা নিয়া গল্প লিখবো! লেখচছ বালা কতা, এইডারে ছাপাইয়া আবার লুকজনের মইধ্যে বিলিও করছ! তোমরার আস্কারা পাইয়া পাইয়া এই বাদাইম্মা পোলাপাইনগুলা এই কাম করার সাহস পা, নাইলে টেঙ্গি-টুঙ্গি ভাইঙ্গা ড্রেইনো ফালাইয়া রাখতাম। হে আমার বাপরে লইয়া লেখে, ইলা বলে মদ খাইয়া ড্রেইনো

পইরা রইছে! আরে ইলা ত অহনও বাইচ্চা রইছে, তুই হেরে লইয়া কেমনে গল্প লেহছ! হে জীবিত মানুষরে গল্প বানাইয়া লাইছে, আর তোমরাও কিচ্ছু কও না!...

: তোমারে বাল্টার বেনিয়ামিন এর একটা গল্প কই; ভুলেও কইলাম ওয়াল্টার বেঞ্জামিন কইয়ো না, রংফর্সাকারী গল্পলেখকের লাহান।...

: হ, তোমার ত খালি পুটকিপুড়া আলাপ!...

: বাল, ইলিগ্গাই তোমার এই দশা... দার্শনিক তার মহাজাগতিক আবরণ ছিঁড়া লোকাল ইমেজে প্রায় পড়ি পড়ি অবস্থা, কোনরকম সামলাইয়া নিয়া কন, 'হুনো আগে... এই বাল্টার বেনিয়ামিন বা সংক্ষেপে বব গেছেন বেকেটের বাসাত; গিয়া দেহেন তার পড়ার রুমের দেয়ালে বড় কইরা লেখা সত্য হইলো পাত্থর আর জানালার শিকের মইধ্যে একটা কাঠের গাধার খেলনা; বেকেট সেই খেলনা গাধার গলার মধ্যে একটা কাগজ ঝুলাইয়া রাখছে, লেখা "আমারও এইটা মাস্ট বুঝা লাগবো।" হি হি হি...কিরম সেয়ানা দেহ,

: হারামজাদা এইডা ত আরেকটা গল্প-ই হইলো! তর লগে মদ থইয়া চা খাইতে বইছি কি তর বাতাপুরামির আলাপ হুনবার লাইগা!...

: না হুইনা আর কি করবি, বিপদে যখন পড়চছ। সবতে আউগ আগে, আইলে পরে এইটা নিয়া ইম্পিলিমেন্টেবল সলিউশনের দিকে যাওয়া যাইবো।...

: কারে কারে কইচছ আইবার লাইগা?

: আইলেই দেখবি।

তালের বড়া ভাজা হইছে। মিষ্টি খাজা আর রসগোল্লার পাশে রাখা আছে। কাঁচের আলমিরাটাতে। টিনের বড় বোলে। খাইবো কি খাইবো না, আবার পেট খারাপ করে কিনা, এই কথা ভাবতেছে দার্শনিক। যখন দুইজনই নিরব, তখন তৃতীয় একজনের দরকার পড়ে; তিনি কবি।

সবুজ স্পঞ্জের স্যান্ডেল পইরা চটাস চটাস শব্দ কইরা তিনি আসেন। চেকের শার্ট। একহাতা গুটানো। আরেকহাতা'র বোতাম লাগানো। ইন ছাড়া। খাকি প্যান্টের ওপর ঝুলতেছে। যেন তিনি দেখেন নাই; তারপরও কোন এক দৈব যোগাযোগের ফলে ওই টেবিলেই আইসা বসেন। জগতের প্রতি ব্যাপক অনীহার পাশাপাশি অসম্মতিপ্রকাশপূর্বক তিনি শুরু করেন, তোমরা এহানো কেন বইছো? আনন্দের চাইতে কি অবকাশ ভালো?' যেন নিজেরেই জিগান। উত্তরের প্রত্যাশা নাই, এই অভিমানের। দার্শনিক পাল্টা উদাস হন। মদখোরের পোলা, যিনি মদখোর, দাঁত কিড়মিড়ান।

কবি বলতে থাকেন,

আমার মইরা যাইতে ইচ্ছা করে
তাই আমি খালি চা আর সিগারেট খাই
ফলে ঘুম আসে না, আবার
কফিও খাইতে ইচ্ছা করে;
এইটারে যে অস্তিত্ববাদ কয়
তুমরা কি তার বালের জানো কিছু!

এই বাল কিন্তু হিন্দি, সূচাগ্র পরিমাণ জ্ঞান হইতে তোমরা তিরোহিত। অস্তিত্ববাদ নিয়া কিছুর জায়গায় লিচুও জানে না, অথচ এই সময়ে গল্প লিখছে। তবু তিনি ত সাহিত্যই করছেন; কিও, আমরা কি তারে এর জন্য মাফ করতে পারি না।

মদখোর আর ধৈর্য্য ধইরা রাখতে পারেন না; তিনিও বলেন, এমনেই যায় না আবার, ত্যানা প্যাঁচায়! তর বাপরে লইয়া লেখলে পরে কইচ এই কথা। তহন আমি কবিতা চুদাইমু নে!

: অশ্লীল কথা বলাটা কি ঠিক? কিঅ, তুমি কিছু কও না!

দার্শনিক তখন নিরবতা দিয়াই আরেকটা কিছু বলার চেষ্টা করেন। এতে দুই পক্ষই বিরক্ত হন। মদখোর এবং কবি। তখন এফেক্টিভ তৃতীয় পক্ষের দরকার পড়ে; যিনি বিকল্প শক্তি গড়ে তুলবেন। বিশেষ কইরা প্রতি পাঁচ বছর পর পর, নির্বাচনের আগে আগে। তিনি রাজনীতিবিদ, সোশ্যাল ওর্য়াকারও; এনজিওতে অথবা ব্যাংকে চাকরি

করেন। সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সাফল্য, কলেজে একবার জিএস ইলেকশন কইরা ফেইল করা।

পায়ে বেইল্টওলা চামড়ার স্যান্ডেল। আফজাল সুজ এর। ধূসর কালারের শার্ট, ইন করা; কালো রংয়ের প্যান্টের ভিতর। একলা আসতে চান নাই বইলা লগে দুইজনরে জোর কইরা আনছেন। একই বাড়ির লোক ওরা। ওরাও জিএস ইলেকশন করতে চায়! না পারলে অ্যাটলিস্ট সমাজ-কল্যাণ সম্পাদক। সদস্য পদে, কোনমতেই না।

উনি সরাসরি প্রসঙ্গে ঢুকেন। প্রথম কথা, এইটা আল্লীগ-বিনপির ব্যাপার না। ডাক্তার সাবরে লাগবো; উনিই ত টাকাটা দিছেন স্মরণিকা ছাপাইবার লাইগা। অ্যাজ অ্যা ফাইনান্সার ওনার রেসপনসিবিলিটি সবার আগে। খালি টাকা দিয়া দায়িত্ব শেষ করলেই ত হইবো না। কী না কী ছাপাইতাছে এইটা দেখবো না! এহন স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আছে বইলা আল্লীগের একজন প্রবীণ নেতা সর্ম্পকে লেখছে। পরেরবার আল্লীগ ক্ষমতায় আইলে বিনপি'র বাচ্চু চাচারে লইয়া লিখবো। আরে সমাজ বইলা ত একটা ব্যাপার আছে নাকি! সাহিত্য ত রাজনীতির উর্ধ্বে না। রাজনীতি করার পরিস্থিতি যদি না থাকে, সাহিত্য কই থিকা আইবো। তারপরে তার ফ্যামিলির অবস্থাটা দেখেন। বাপ ত ভালো মানুষ। কারো'র সাতে-পাচে নাই। ছোটভাইটা ত ভালোই গান গা... মানে, ছোট শহরেও রাজনৈতিক নেতা থাকেন। যিনি পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, কি করিতে হইবে? যেহেতু লেনিনও পড়ছেন।

সবাই মিইলা ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়া হয়। রাজনৈতিক কর্মী দুইজনের একজনরে দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষকরে নিয়া আসার এবং আরেকজনরে দায়িত্ব দেয়া হয় প্রেসক্লাব থিকা সাংবাদিক সাব'রে নিয়া আসার।

চেম্বারে গিয়া দেখা যায়, উনি রোগী দেখতেছেন। রাত আটটা পর্যন্ত দেখবেন। ততক্ষণ উপরের রুমে বসতে রিকোয়েস্ট করা হয়। চা এবং পুরি পাঠানো হইতেছে। যে কোন অপেক্ষাই অনর্থক নয়। এইরকমের অনুসিদ্ধান্তসহ।

উপরে উইঠা দেখা গেলো, কৃষক সমিতির মান্থলি মিটিং হইতেছে। মোজাইক করা ফ্লোরে, পাটিতে বইসা। থানা কমিটির সভাপতি, যিনি এমনিতে টেইলার্সের দোকান চালান, বলতেছেন, বধূনগরের থিকা তিনজন কৃষক আসার কথা ছিল; হেরা কি আসছিলো? মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা না শুইনা আমাদের কর্মসূচী ঠিক করলে সেইটা সফল হবে না।...' কিছুটা হয়তো বলার ছিল এবং কিছুটা হয়তো শোনানোর জন্যও আছিলো।

সবাইরে ঢুকতে দেইখা কইলেন, 'বস, বস;...তোমরা বস। আমাদের মিটিং শেষের পর্যায়েই; সিদ্ধান্তগুলা লিইখা আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি করবো।

চা পুরি খাইতে খাইতে কথা হইতে থাকলো।

‘যেটা হইছে, সেইটা অবশ্যই বাজে এবং পলিটিক্যালি এইটা ত কারো জন্যই ভালো না। ছেলেটা ভালো, কিন্তু কেন যে এই আকামটা করলো। নিজেরে বড় মনে করলে ত হবে না। বরং পার্টির জন্য ক্ষতি। ওরা ত একসময় পার্টিতেই আসবো। আর কই যাইবো।’ কৃষক সমিতির সভাপতি বলতেছিলেন। শাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরা।

একটু সময় পরে একজন রাজনৈতিক কর্মী আইসা জানাইলেন, শিক্ষক আসতে পারবেন না; সামনে মেট্রিক পরীক্ষা, সন্ধ্যার পরে আরেকটা একস্ট্রা বেইচ পড়ানো লাগতেছে। তবে সবাই যেইটা বলবে, তার সাথে উনার কোন দ্বিমত নাই। উনি সমাজের সমষ্টির পক্ষে; ব্যক্তির চাইতে সমাজই বড়। সমাজের স্বার্থ দেখতে হবে। এইরকম। যদিও অনেকেই বুঝতে পারলো, তিনিও যেহেতু একজন গল্পলেখক, ব্যাপারটারে তিনি এড়াইছেন। আসেন নাই কারণ পরবর্তীতে, ঐতিহাসিকভাবে উনার সংশ্লিষ্টতা যেন প্রমাণযোগ্যভাবে না থাকতে পারে। এইটুকু জায়গা সমাজ ত ইগনোর করতেই পারে! করেও; নরমালি ছোটগল্প এইটুকু ফাঁকের মধ্যেই অপারেট করে, সমাজে।

সমাজের স্বার্থটা যে কী, সবাই তখন তা ভাবতে শুরু করেন। খুববেশি দূর পর্যন্ত ভাবা লাগে না কারণ সমষ্টি হিসাবে নিজেদের আস্থাটা নিয়াই সবাই খুশি হইতে থাকেন। ভাবনার আর দরকার পড়ে না। এইরকম অদরকরি টাইমে তখন ডাক্তার সাহেব আসেন। উনি সর্বদা হাসিসুখ, হাসিমুখ। স্লিম ফিগার উনার। যদিও রাস্তায় কমই হাঁটেন। কেউ উনারে রিকশা ছাড়া কখনো হাঁইটা বাইরে রোগী দেখতে দেখে নাই। মানে, এইটুক প্রেস্ট্রিজ উনার আছে।

আরেকজন রাজনৈতিক কর্মী আসেন; বলেন যে, সাংবাদিক সাব আসছেন। পরের রিকশাতেই। একটু পরেই হয়তো ঢুকবেন।

সাংবাদিক সাব প্রতিষ্ঠিত বাড়ির ছেলে। বিবিসির জন্য আতাউস সামাদ যেইরকম, ছোট শহরে তিনিও এইরকম বাহ্যিক, ছোট শহরে থাইকাই রাজধানীর রিপ্রেজেন্ট করেন এবং এর সাপেক্ষে ছোট শহররে দেখার মতো একটা স্পেইসে নিয়া আসেন যে, এইটা ত আসলেই ছোট শহর, যদিও ইর্ম্পটেন্ট। স্বভাবতই উনি গম্ভীর, ইæর্পটেন্ট হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে। প্রাথমিক আলাপের পরে বলেন যে, এর ত একটা বিহিত করাই লাগবে। আমি আজকে সিরাইজ্যা পাগলার দরবারে যাইতেছি। আগামীকাল সকাল এগারোটার সময় প্রেসক্লাবে একটা মিটিং ডাকেন। এর সাথে জড়িত সবতেরে কইবেন; মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতির ঢাকায় যাওয়ার কথা আগামীকাল, সেক্রেটারি যাতে মাস্ট থাকে। দক্ষিণ পাড়ার ঘটনা হইলেও উত্তর পাড়া'র বইশ্যা রাজাকারের গুষ্ঠির লোকও রাখতে হবে। লিল মিয়ার বাড়ির কাউরেও রাইখেন। নাইলে পরে হেরা ঝামেলা করবো।...গল্পলেখকরে মুরব্বীর পাও ধইরা মাফ চাওন লাগবো।... রায় উনি তখনই দিয়া দেন অবশ্য।

এইরকম একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিতর জমায়েতের শেষ হয়।

নিউমার্কেটের পাশেই প্রেসক্লাবের গলি। হর্কাস মার্কেটের পাশে। কাচারির বাইরের ঘরটা, এমনিতে। চারদিকে দেয়াল দেয়া, উপ্রে টিন।

তিনটা বসার টেবিল তিন কোণায়। তাস খেলার জন্যই বসে লোকজন, সন্ধ্যায়। এক কোণায় একটি টিভি। তার সামনে চারটা চেয়ার।

এখন জনা বিশেক লোক। হাতল ছাড়া ছোট কাঠের চেয়ারে গোল হয়া বসছেন, ঘরের মধ্যে। ইনটেন্স একটা অবস্থা। রায় ঘোষণার পর।

রায়ের সামারী মোটামুটি এইরকম-

স্মরণিকার সমস্ত কপি বাজার থিকা প্রত্যাহার কইরা নষ্ট কইরা ফেলতে হবে। কোনরূপ অনুলিপিও রাখা যাবে না। বলাকা ফটোষ্ট্যাটরে এইটা বইলা দিতে হবে।

এরপরে এইরকম কোন স্মরণিকা করতে হইলে প্রেসক্লাবে সভাপতিরে সবগুলা লেখা দেখাইয়া নিতে হবে, ছাপানোর আগে। সভাপতি নূন্যতম দুই সপ্তাহের মধ্যে উনার মতামত জানাইবেন।
বিজ্ঞপনদাতা এবং আর্থিক অনুদানপ্রদানকারীদেরও এই বিষয়ে সচেতন হইতে হবে। এই গল্পকার ভবিষ্যতে সমাজে এইরকম অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করবেন না এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে এবং একজন প্রবীণ নাগরিকের সম্মানহানির অপরাধে উনার কাছে মাফ চাইতে হবে।

মাঙ্গির পুত, তুই আমার বাপের পাও ধইরা একঘন্টা বইয়া থাকবি! শুয়োরের বাচ্চা... কানতে কানতে মদখোরের ছেলে, যে নিজেও মদখোর, ন্যায়বিচার পাইয়া উদ্বেলিত হয়া উঠে। সাধারণত বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে অস্থিরতায় যা ঘটে, গল্প-লেখকরে মারতে যায়। উপস্থিত জাগ্রত জনতা আইসা তারে বাঁধা দিক, এইটাও সে চায়; এই কারণে বলার পরেই সে মুভমেন্টটা শুরু করে; যেন বলা ও করা একইসাথে সম্ভব না। আশ্চর্যজনকভাবে (দার্শনিক ভাবে) জমায়েতও তার কর্তব্য বুঝতে পারে, তিন-চাইরজন উইঠা গিয়া তারে জড়াইয়া ধরে।

মদখোর বাবা পুত্রের এইরকম আবেগে একটু লজ্জাই পান। বলেন, আরে হেরে ধরছ না তরা। আর অপেক্ষা করতে থাকেন কখোন গল্পকার আইসা তার পায়ে ধরবো। জীবনে মেম্বারি ইলেকশনটাও তিনি জিততে পারেন নাই, এই মদ খাওয়ার কারণেই হয়তো। ভাবতেছিলেন, যে কোন বিজয়ই অস্বস্তিকর, কারণ বিজয়ীর মতো আচরণ করতে হয়। আর তিনি তা পারতেছেন না। যতক্ষণ না পায়ে ধরতেছে, বিজয় ত ভিসিবল হইতেছে না। মাফ কইরা দিছি - বলা যাইতেছে না।

একটা সময় অপেক্ষার পরে গল্পকার হয়তো মাফ চায়া ফেলেন বা চান না। কিছু একটা ঘটে যার ভিতর দিয়া ঘটনাটা শেষ হয় বা হয় বইলা আমরা ভাইবা নিতে পারি। এমনিতে তো কোন কিছুই শেষ হয় না, আরেকটা শুরুর কাছে গিয়া আমরা আটকাইয়া থাকি। কিন্তু যেহেতু উনি পরে আর কখনোই গল্প লেখেন নাই, ঘটনাটা কেউ আর মনেও রাখে নাই। মানে, মনে রাখার পরেও অনেককিছু আমরা তো ভুইলা যাইতেই পারি।

এরপর থিকা ছোট শহরে গল্প লিখা বন্ধ থাকে, অনেকদিন। সম্ভবত এই সময়টাতেই রণজিত দাশ কোন ছোট শহর ভিজিট কইরা থাকতে পারেন। হালকা রোমান্টিক গল্প লেখার ভিতর দিয়া এই গুমোট অবস্থাটা কাটে একটা সময়। যখন জীবনানন্দের কবিতার পরে উনার গল্প-উপন্যাস আবিষ্কার হয়, ব্যাপকভাবে। শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, সিকদার আমিনুল হক, রবীন্দ্র গোপরা ভাবেন; বাপরে, তাইলে আবার দুই চাইরটা গল্পও লিখা লাগবে, কবি হইতে হইলে! রণজিত দাশও একটা উপন্যাস লিখেন। এইরকম।

বাঘের বাচ্চাটা বড় শহরে বইয়া ছোট শহরের লাইগা কান্দে। কিশোরী মেয়েটা ইন্ডিয়া চইলা যায়। ওরা পর¯পরকে চিঠি লিখে - আমরা আবার ছোট শহরে একদিন ঘুরতে যাবো!

সেই ঘুরতে যাওয়া আর হয় না কোনদিন; বরং এই গল্পটা পড়তে পড়তে এক ধরণের বিস্বাদ ধরণের বিষাদ আসে তাঁর মনে, তাঁহাদেরই মনে। কেউ কেউ কবি, কিন্তু সকলেই গল্পকার তাইলে!

ছোট শহরের কেউ কেউ তখন বইটা ছাপা হইলে এই গল্পটা পড়ে।

ডিসেম্বর, ২০১৩

ফটো: দঈত আননাহাল

গল্প-লেখকের স্বপ্ন

একটা উপন্যাসের দুইটা চ্যাপ্টার লিইখা বইসা আছি। স্কেলিটনটা দাঁড়া করানো গেছে মোটামুটি। আরেকটু হয়তো কাজ করা লাগবে। এমনিতে থিমটা মোটামুটি দাঁড়াইছে। কিন্তু যেইটা সবচে ভালো হইছে, সেইটা হইলো নামটা। দুর্দান্ত রকমের পছন্দ হইছে। যে কারোরই পছন্দ হবে। যে কারো বলতে অবশ্যই লেখক-

ইন্টেলেকচুয়াল সমাজের লোকজন। সবাই মোটামুটি টাস্কি খায়া যাবে। মানে, নামেই উপন্যাসের অর্ধেক কাজ শেষ।

মুশকিল হইলো, লেখা আর হইতেছে না। একটু একটু লেখি। আবার আটকাইয়া যাই, আগাইতেছে না। এইজন্য ভাবলাম, কয়দিন লেখালেখি বাদ দিই। একটু ঘুরাফিরা করি। আমাদের এই লাইফ স্বপ্ন যেহেতু, যে কোন জায়গাতেই ত যাইতে পারি। এইরকম একটা ফ্রিডম, ফুরফুরা ভাবে রাস্তায় হাঁটতেছিলাম। তখনই সমস্যাটা টের পাইলাম। যেহেতু জিনিসটা স্বপ্ন; এইটাতে আমার খুব একটা কন্ট্রোলও নাই। ঘটনা সবসময় সামনেই চলে না, ব্যাকওয়ার্ডেও যাইতে থাকে। এই অস্বস্তি থিকাই হাসান আজিজুল হক আসলেন বাসায়। উপন্যাস লেখায় খুব একটা মনযোগ দিতে পারেন নাই বইলাই হয়তো উনার কথা মনে আসলো। আসলেন মানে তিনি ছিলেনই।

স্বপ্নে তিনি ভিজিবল হইলেন আর কি। শাদা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। চোখে চশমা, মুখে রাঢ়বঙ্গের মফিজ হাসি। বুকের লোমগুলাও শাদা। পায়রা না হইলেও শান্তির প্রতীকই ভাবা যায়। কিন্তু শান্তির অপজিটে ত যুদ্ধ থাকে; মানে, যুদ্ধ না থাকলে ত কারো শান্তির কথা মনে করার কথা না। এইরকম বাজে ভাবনা হইলো যে, যেহেতু শান্তি আছে; যুদ্ধও আছে কোথাও না কোথাও আশেপাশে। এইটা না থাকলে আলাদা কইরা শান্তি থাকার কোন কারণই নাই।

হাসান আজিজুল হক এখন রিটায়ার্ড লাইফ পার করতেছেন বইলা সমাজের জীবন-যাপনের সাথে উনার যোগাযোগ কইমা গেছে। এর ওর বাড়িত থাইকা, সোশ্যাল লাইফ ফিল করার চেষ্টা করেন এবং সামাজিক গল্প লিখেন। আমাদের ফ্যামিলিতে কোনভাবে রিলেটেড, বেড়ানোর লাইগা আসছেন। কিন্তু উনারে নিয়া অস্বস্তিটার সাথে উপন্যাসের নামের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। আমি ঠিক শিওর না।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবতেছিলাম, কোনদিকে যাই। বিকালবেলাতেই বাইর হইছিলাম মনে হয়। কিন্তু এখন একটু সকাল সকাল মনে হইতেছে। সবাই মর্নিং-ওয়াকে বাইর হইছে। এর পরেই মনে পড়লো হঠাৎ চাকা (গায়ত্রী চক্রবর্তী) আসছেন আমাদের বাড়ি। গোলগাল চেহারা উনার, কিন্তু নাদুস-নুদুস না। আমার ফ্রেন্ড। যেইরকম মানস চৌধুরী গেছিলেন সুস্মিতা চক্রবর্তীদের বাড়িতে পূজা দেখতে, কিশোরগঞ্জে; সেইরকম ঈদ দেখতে আসছেন চাকা, আমাদের বাড়িতে। ঈদে ত দেখার কিছু নাই, তারপরও কেন যে আসছেন তিনি!

তিনিও বাইর হইতে পারেন, এইরকম ভাবতেছিলাম। একটু আগাইতেই উনার সাথে দেখা। পরনে তাঁতের শাড়ি, কপালে টিপ এবং মোস্ট অ্যামাজিংলি সিঁদুর নাই, চুলের সিঁথিতে। মানে, আমি বিয়া নিয়া কিছু ভাবি নাই; কিন্তু এইটা যে একটা এক্সপোজড বিষয় না, ব্যাংকের মর্টগেজ-করা সম্পত্তির সাইনবোর্ডের মতোন; এইটা একটা রিলিফ। কি কারণে জানি না ঠিক, তবে পুরুষ-সমর্থিত নারীবাদের একটা প্যাটানও হইতে পারে, যেইটা সিমন দ্য বেভোয়ার বলতেছিলেন যে, আরো

মারাত্মক; যে, তুমি ত এখন ফ্রি, তাইলে ত যে কারো সাথেই সেক্স করতে পারো! একটা তো হইলো যে, তোমার তো জামাই নাই, সো তুমি সেক্সুয়ালি স্বাধীন - এইটা মানুষ ভাবে; আরেকটা হইলো অন্য মানুষ যা ভাবতে পারে বইলা আমি ভাবতে পারি, সেইটাই আমি হইতে থাকলাম। তারপরও আমি ইগনোর করি এই ভাবনারে। ওই ট্রাপে পড়ার আগে আমি অন্যকিছু দেখতে থাকি।

রাস্তায় আরো লোকজন। আশ্চর্য ব্যাপার হইলো, প্রায় সবাই জোড়ায় জোড়ায়, মানে কাপল। মহিলাদের কারো চুলের সিঁথিতেই সিঁদুর নাই এবং পুরুষদের সবারই একটু না একটু ভূড়ি আছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, এঁরা বিবাহিত। আমিও যেহেতু চাকার পাশে হাঁটতেছি, তাইলে আমিও নিশ্চয় বিবাহিত, কিন্তু চাকার সাথে না। ওরা এইটা ভাইবা নিলো বইলা আমি ভাবলাম। একটা জিনিস মিলাইতে পারেতছিলাম না, আমি যখন উপন্যাসটার কথা ভাবতেছিলাম, তখন আমি ত কিশোর, পনের-ষোল বছর বয়স হবে। এখন যেহেতু এই কাপলদের সাথে আছি আমার বয়সও নিশ্চয় চল্লিশের ঘরে। এইটা একটা কনফিউশনই, কোন ডিসিশানে আসতে পারি নাই আর।

এই কনফিউশনটারে এক্সপ্লেইন করার লাইগাই মনে হয় ব্যাপারটা একটু ঘটনার মতো দাঁড়াইলো। হঠাৎ কইরা এই তিন-চাইরটা কাপল রাস্তার একপাশে সইরা গেলো; যেইখানে দুইপাশে ঝাউগাছের আড়াল। এঁরা এইটার জন্যই অপেক্ষা করতেছিল আসলে। সেইখানে গিয়াই ওরা নিজেদেরকে কিস করা শুরু করলো। আমি আর চাকা দাঁড়াইয়া গেলাম ওদের পাশাপাশি। সবারই গায়ে গা লাগার মতো

অবস্থা। ও, গ্রুপ অর্জি শুরু হইছে তাইলে! আমাদেরও ত শুরু করা দরকার। আমি আর চাকা কিস করলাম। আর চাকার মাইয়ে রাখতেই ওর মুখটা শুকাইয়া গেলো।

কারণ আমি ভাবলাম যে, ও আমারে রুমেল ভাবছে। রুমেল চল্লিশ বছর বয়সে চাইর-পাঁচবার রিহ্যাব ঘুইরা, ড্রাগ ছাড়ার শেষ ভরসা হিসাবে বিয়া করতে গেছে। বউ ত সুন্দরী। খুশিমনে বিয়া করছে। কিন্তু বাসর রাইতের পরে সিরিয়াস মন-খারাপ। কি ঘটনা? আরে মামা, বলিস না; মাগী ত বিরাট ধরা খাওয়াইছে। বিয়ার আগে ত মাই ধরতে পারি নাই, উপর থিকা দেইখা ত বড়-ই মনে হইছে; বাসর রাতে ব্লাউজ খোলার পরে দেখি কি, এত্তটুক! শালা, আগে দেখলে ত বিয়া-ই করতাম না! আমরা, তার অ্যাডিক্টেড বন্ধুরা, বেশ খেইপা গেলাম, নারী-শরীরের এই অপমান দেইখা; কইলাম, শালা তুই যে ড্রাগ-অ্যাডিক্টেড এইটা জানলে, মেয়েটা তোরে বিয়া করতো নাকি! এইটা ভাইবা দেখ। আর প্রতারণা ছাড়া কোন সর্ম্পক হয় নাকি এই দুনিয়ায়! শালা, ফেটিশ করার লাইগা তোর মাই-ই কেন লাগবো; এইরকম। কিন্তু রুমেলের দুঃখ ওয়াজ রিয়েল; রিহ্যাবে, দিনে তিনবেলা হেরোইন না নিতে পারার মতোই। কোন সান্ত্বনা নাই এর।

আমার ব্যাপারটা মে বি একইরকম না। পার্টিকুলার কোন ফিমেইল অর্গানে ত আমার অ্যাজ সাচ ফেটিশ নাই। থাকলেও, নিজেরে নিয়া ভাবতে চাই না আমি। আর তখনই বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা আসলে অন্যখানে। চাকা আমার বউয়ের কথা ভাবতেছে। তার সুন্দর মাই জোড়ার কথা। আমাদের সেক্সের সময় আমি সেইটা এনজয় করতে পারি। এখন সেই সম্ভাবনাটা নাই। বা অভ্যাসটা রেপ্লিকেট

করা সম্ভব না। কিন্তু এইটা আমার কাছে জরুরি না। চাকার মাইয়ে হাত রাখার পরে হাতটা যে একটু থাইমা ছিলো, সেইটা থিকাই এই বিষাদ। আমি জানি আই ক্যান কাভার ইট আপ। আমি ওর শরীর পছন্দ করি। শরীরের বাঁকগুলি। হাঁটাপথ, বাদামি রংয়ের। কি নির্জন! যেন অনেক আগে কেউ একজন হেঁটে গেছিলো, তারপর একলা পইড়া আছে। গরমের দিন, কিন্তু বাতাস বইতেছে, খ্রীষ্টীয় আঠারোশ শতকের বাংলায়, বঙ্গভঙ্গ হয় নাই তখনো। এইরকম। মানে, এইরকম কাব্যিক না হইতে পারলে শরীর যে শরীর সেইটাও কি আর ফিল করা পসিবল!

কিন্তু তখনই আবার সবাই তটস্থ হয়া ওঠলো। ফিরা আসলাম ফ্রি একুশ শতকে। না, না এইটা ত ঠিক হইতেছে না। পরকীয়া করা যাবে কিন্তু গ্রুপ অর্জি তো এখনো জায়েজ না আমাদের মুক্তমনে! একটু পরেই এই ঝোপের সামনে দিয়া একটা পাজরো জিপ যাবে; আর সেইটা কালো ধোঁয়া ছাড়বে আমাদের দিকে, তখন আমরা সবাই তখন ভ্যানিশ হয়া যাবো। এই পাপের কারণে। কিছু করলে যার যার বাসায় গিয়া করেন। গ্রুপ অর্জি করা যাবে না। কেউ মনেহয় বলতেছিলো বা আমি-ই নিজে নিজে ভাবতেছিলাম।

শিট, এইটা ত ম্যাজিক রিয়ালিজম হয়া গেলো! মার্কেজ কেন পত্রিকার পাতা থিকা এইখানে হিজরত করলো! প্যাঁচ লাইগা গেছে। এখন কাহিনি তো আগাইতে পারবো না। তাইলে উপন্যাসের নামটা এখন কই?

চাকা বাসায় আসার পরে হাসান আজিজুল হক তারে পাইলো। বুইড়াগুলি এইরকম, কথা দিয়াই সেক্স কইরা ফেলতে চায়। কইলো, আমি ত একটা উপন্যাস লিখতেছি, নাম হইলো; এই। চাকা কয়, ভালোই ত হইছে নামটা। আমি তখন রাগে ভিতরে ভিতরে গজরাইতেছি। শালা, আমার উপন্যাসের নামটা মাইরা দিলো! আমি হক সাবরে জিগাইলাম, কি লিখছেন আপনি কন? আপনে ত কিছু লিখেন নাই; লিখছি ত আমি, এই নাম দিয়া। ল্যাপটপটা খুইলা চাকার হাতে দিলাম। সে দেখলোই না। এইসব নিয়া ওর কোন ফিলিংস নাই। মানে যে-ই লিখুক, একজন লিখলেই হইলো, আর কি লিখলো এইটা নিয়া তার কী, এইরকম একটা ব্যাপার। সেক্সটাই মেইন, কে কেমনে কি করলো এইটা যাঁর যাঁর তাঁর তাঁর ব্যাপার।

চাকা তখন বিছনায় হেলান দিয়া ইশিগুরুর নেভার লেট মি গো পড়তেছিলো।

অনেকক্ষণ পরে। এর মধ্যে, আমরা চা-নাস্তা খাইতেছিলাম। টিভি দেখলাম। আরো অনেকে আছিলো। চাকা ইশিগুরুর বইটা রাইখা ল্যাপটপে না দেইখাই কয়, না, এইখানে ত তোমার কিছু পাইলাম না!

আমি আর ল্যাপটপ'টা খোলার সাহস-ই পাইলাম না। যদি উপন্যাসের ড্রাফট'টা না থাকে। আর চাকা-ই যদি না দেখে, বালের এই উপন্যাস লিইখা কি লাভ! প্রেমের লাইগাই তো আমাদের এই সাহিত্য। বালের টাকা-পয়সা তো আর কেউ দিবো না।

মেজাজটা খুবই খারাপ হয়া গেলো। হক সাব'রে নিয়া বাইর হয়া গেলাম।

মোড়ের চা এর দোকানে গিয়া দেখি আরো গল্প-লেখকরা বইসা আছে। কায়েস আহমেদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস আর মাহমুদুল হক। চা খাইতেছে। স্বপ্নে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস দেখি অন্যরকম; খুবই হাসি-খুশি, মাই ডিয়ার; এমনিতেও উনি তাই, ঢাকা কলেজে পড়ার সময় দেখছি উনারে; করিডোর দিয়া হাঁইটা যাইতেছিলেন আর আমারে দেইখা হাসছিলেনও একদিন; যেহেতু ছাত্র ইউনিয়ন করি, দেয়াল পত্রিকা করি; কিন্তু এইখানে অন্যরকম, ছেমড়া টাইপের। হাসান আজিজুল হক-এর পিঠে চাপড় দিয়া কয়, কি রে, কি খবর? আরেকটা উপন্যাসের নাম মাইরা দিছোস? বইলাই, হো হো কইরা একটা হাসি দেন। সবাই হাইসা দেয়। আমিও একটু রিলিফ পাই। হাসান আজিজুল হক ধরা-পড়া চোরে'র মতো হাসেন, যে জানে যে তার কোন শাস্তি হইবো না। জাস্ট ফান, এইটা।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কয়, আরে কইও না; শালা, চৌদ্দটা উপন্যাসের প্লট লিইখা বইসা আছে, কিন্তু নাম দিতে পারে না। এইজন্য পুরাপুরি লিখতেও পারতেছে না। কারো কাছে কোন নাম শুনলেই মাইরা দেয়। আমিও ভাবি যে, মেধাস্বত্ব আইনে আমার নামটা কি টিকবো শেষ পর্যন্ত? কারণ তিনটা শব্দ পর্যন্ত মনে হয় এলাউড, অন্যের লেখার তিনটা শব্দ ইউজ করলে আর বলা লাগে না, কিন্তু আমার উপন্যাসের নামটা চাইর শব্দের। কিন্তু হক সাব যদি দুইটা দুইটা জোড়া দিয়া চাইরটারে দুইটা বানাইয়া ফেলে, তাইলে কি হবে?

আরে, লেখকদেরকে নিয়া আমি কেন স্বপ্ন দেখতেছি? এইগুলা ত গল্প-লেখকের দেখার কথা।

আল্লা বাঁচাইছে, এইটা ত তাইলে গল্প-লেখকের স্বপ্ন। আমার না।

এপ্রিল, ২০১৪

ফটো: দঈত আননাহাল

দঈত আননাহাল

দঈত আননাহাল লিখতে গিয়া লিইখা ফেললাম দঈত আনহালাল; শালা, মাঝে মইধ্যে এইরকম টাল!

ত, এইরকম টাল জিনিসরেও কবিতা মনে হইতে পারে; যে টললো, টলোমলো, কবিতা হইলো। এইরকম শব্দের প্যাঁচ দিয়া, চুলরে বাল এবং বালরে চুল বানাইয়া যে সহজ-সরল মরমী বেদনার কবিতা, তার ভাব ও ভঙ্গিমা কতজনরে যে চ্ইুদা শেষ কইরা দিছে; তার প্রমাণ আজো (জীবনানন্দ) উৎপাদিত হইতেই আছে! টু বি কন্টিনিউ নামে...

আমি যে নামটা ভুল লিখছি সেইটা ভুল। টালামি না পুরাটা; প্রথম নাম শুনলে কয়েকবার উচ্চারণ করা লাগে, তারপর লিখলে লিখাটা সহজ হয়। আমি ভাবছিলাম যে ভুল লেখার জন্য সরি বলবো একবার। কিন্তু লিইখা ত ফেলছি, সরি বললে কি আর ফেরত আসবে! বরং আরো প্যাঁচাইতে থাকবে। এরচে বেটার পরে যাতে আর ভুল না লিখি। সরি বললে ভুইলা যাবো যে ভুল করছিলাম; কারণ সরি দিয়া ভুলটারে ভুলে যাওয়ার যোগ্যতা আমি পাইলাম। ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট। কিন্তু এই যে বললাম না, এইটা মনে থাকবো বেশিদিন। কিন্তু একটা সময় পর্যন্তই। এর পরে আরেকটা নাম ভুল লিখা হবে। এইটা যদি চলতেই থাকে, তাইলে সব নামই কি ভুল লিখবো আমি? এইটা সর্ট অফ টালামি হইছে।

বিল্ডিং থিকা নাইমা দেখি বরই গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঝালমুড়ি খাইতেছে শে। গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছে। বলতেছে, ছয়টা দিন অনেক রিল্যাক্সে কাটলো। মালয়েশিয়ায় গেছিলাম। ওইখানে জন্তু জানোয়ার দেইখা ভালো লাগলো। ওদের ইকো পার্কটা বেশ রিচ। এইরকম ছুটি দরকার মাঝে মধ্যে। আমি হলের দিকে যাইতেছিলাম। হাতে নেটবুকের পাউচ ব্যাগ, টিস্যু বক্স এবং বই নিয়া বেশ

ঝামেলাতেই আছি। হাত দিয়া বেড় পাইতেছি না। জিনিসগুলা সব পড়ি পড়ি করে। ওরা আরো কি কথা বলে এইটা শোনার জন্যই হয়তো আমার এই যাওয়াটা রিউইন্ড করলাম একবার।

কিন্তু আর কোনকিছু শুনি নাই। দেখলাম, দেখে নাই শে আমারে। দেখেই নাই শে আমারে। কিন্তু আমি যে দেখছি, আমার অস্বস্তিটাই খালি। আরো মনে হইতে থাকলো, আর কি কি অস্বস্তি আমার আছে। যেমন, হলে বালিশ না থাকলে মোটা কয়েকটা বইয়ের উপর গামছা চাপা দিয়া যে আমারে ঘুমাইতে হয় এই কথা বলার ভিতর দিয়া মাহি ভাইয়ের সাথে ইউনির্ভাসিটিতে চান্স পাইয়া বৈধভাবে সিট এলোটমেন্টের ক্ষমতা দেখানোর রাতটারে কি আমি গোপন করতে চাইতেছিলাম যেহেতু উনার আচরণের ভিতর উনি এমনই ভদ্রলোক এবং নিয়ন্ত্রিত যে আমি পারি নাই নিজরে লুকাইতে আর; নানা পাটেকার হইছি আবার।

এইরকম হয়। আমি বইলা ভিজিবল যে জিনিস তার বাইরে হঠাৎ একটুখানি যে প্রকাশিল, সে-ই 'আসল' হয়া গেলো। এই পরিচয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। যে আসল, সে ত আসলে একটুখানি। তারপর খালি স্মৃতি কল্পনা এবং অন্যান্য রকমের ভিতর লেপ্টালেপ্টি।

পরে এর প্রতিদান পেয়েছিলুম। ঈদের ছুটির পরে হলে আইসা দেখি টিচার কোয়ার্টারের এক্সটেন্ডশন হিসাবে রুমটাই গায়েব হয়া গেছে! যেহেতু প্রতিশোধ নেয়া হইছে আমার উপর, আমি আর কুকামটা করিই নাই, এইভাবে ভুলে

গেছিলাম। ভুল ছিলাম আসলে। এই যে মনে পড়লো, তখন আর নানা পাটেকর হইতে চাইলাম না। টু বি ফ্রাঙ্ক, পারলাম না আসলে। কিন্তু তারে কি আর এভেয়ড করা গেলো! কামটা করলাম না, কিন্তু এই যে না-করা সে ত ছিল আমার মনের গভীর গোপনে। মুখে একটু একটু দাড়ি-গোঁফ, কাঁচুমাচু, ছোটখাট আগ্নেয়গিরি। ভাবতেছিলাম, যেহেতু সে সৎ, তার আছে চিৎকার করার অধিকার! গান না-গাওয়ার।

আমি ভুল লিখছিলাম এইজন্য চুপ কইরা আছি। আবার এর অর্থ এইরকম যে আমি আর বলতেই পারতেছি না। আটকাইয়া গেছি। কিছু দূর পর্যন্ত যাইতে পারলে ভালো। তাইলে অনুমান সম্ভব হয়। অথবা এতোটাই দূর যে কোন অনুমানই নাই। অনুমানহীন একটা জীবন আমরা পার কইরা গেলাম। যা যা আছে তা তা-ই আছে। যা যা নাই তা তা আর নাই। এইরকম।

অথচ কচ্ছপের মতোন খোল থিকা মাথা উঠে। আবার ঢুকে যায়। সাগরের পারে বালুতে সে হাঁটতেছে। ভাবতেছে। এরমধ্যে লালচোখের ঘরগোশ যে সে বাইর হয়া গেলো। আমি ভুলে গেছিলাম এখন সন্ধ্যা। নরোম আলো নিবে যাচ্ছে দেখে মনে হইলো, কেন গেলাম না আমিও। নির্দিষ্ট দূরত্বে ফলো করতে করতে গোয়েন্দা কাহিনির মতোন, তোমার গোপন প্রেম আবিষ্কারে? গাড়িটা ঢাকা ইউনির্ভাসিটি'র চারুকলা থিকা বাইর হয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ শাহবাগ থিকা বামে ধানমন্ডি না গিয়া যাইতে থাকলো সোজা বনানী'র দিকে। ১১ নাম্বার রোডের মাঝামাঝিতে। ওহ ক্যালকাটা'র সামনে গিয়া থামলো। শেষমেশ র'এর এজেন্ট? যেই বাংলায় মাসুদ

রানা মিত্রারে নিয়া বিছনায় গড়াগড়ি খায় সেই বাংলাতে র'এর এজেন্টের সাথে তুমি সন্ধ্যার রেস্তোঁরায়! আমিও যাই।

গিয়া জিগাই, স্টাটারে কি পাকোড়া আছে?

ওয়েটার কয়, ওইটা ত নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার, পাল আমলে কৌনজে খাওয়া শুরু হয়। আপনে মিষ্টি খাইতে পারেন।

কিন্তু মিষ্টি ত আমি খাওয়ার পরে খাই। দিনাজপুরের পাপড় দেন তাইলে। ভাতটা কলাপাতায় দিয়েন না। খেজুর ত অবশ্যই বেচেন না, তাই না?

না, না আমাদের দেখাদেখি নদ্দায়, বারিধারার নর্দমা যেইখানে, অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতী'র নর্মদা না; বেশ ডার্টি একটা প্লেইসে ওহ ঢাকা! নামে খুলছে একটা। ওইখানে খেজুর পাইবেন। ওরা প্রকৃত বাংলা খাবার চিনে না। আমরা কিন্তু ভাতের চাল গঙ্গার জল দিয়া ধুই! আপনার কমর্ফোটের জন্য বললাম। ইর্ম্পোটে অনেক টাকা খরচ হয়। বুড়িগঙ্গার যা অবস্থা। ডেইলি স্টার'টা দেখতে পারেন।

আমি উনার সাথে আরো কথা কই। আর চোরা চোখে দেখি জুলিয়েটরে। এরা ত বঙ্গের গান বাজায়। লোকটা চইলা যায়, খাবার আনতে। আমি মোবাইলে হেডফোন লাগাইয়া গান শুনি। জুলিয়েট তুমি কখোন বুঝবা, আমরার দোষের কিছু নাই। খালি টাইম ইজ রং। তোমার স্বপ্ন যে আমি দেখছি এইজন্য তুমি তোমার স্বপ্নে এইখানে

আসছো; এইটাই রিয়েল। টিভিতে যেমনে কথা কয় আমি সেইরকম কইরা কইতে পারবো না। ছন্দে লিখতে পারবো না একটা প্রেমের কবিতা। তুমি দেখতেছো আমারে। আর কইতেছো, কেন তুমি এইখানেও! তুমি যাও!! আমারে ডিস্টাব করা বাদ দাও! আমি তোমার সাথে সবকিছুই করতে রাজি আছি। স-অ-অ-ব। খালি ভালোবাসতে কইও না। তুমি শালা কখোন বুঝবা, জাস্ট দ্য টাইম ইজ রং।

এইটা ত আসলে একটা সান্ত্বনা। এই বিভ্রান্তি।

আমি মনে করতে পারলাম, কেন তুমি কানছিলা যখন আমাদের শরীর আমাদের জড়াইয়া ছিল আর তুমি বলতেছিলা, আই উইল লাভ ইউ টিল আই ডাই! তুমি আসলে মরতে চাইছিলা; যেহেতু প্রেম আর কনটিনিউ হইবো না, আমাদের মইরা গেলে কী হয়! এইরকম।

আকাশে তারারা জাগতেছে। কাঁচের জানালা দিয়া দেখা যায়। তুমি চেয়ার থিকা উঠে দাঁড়াইলা। হিল পড়ো না তুমি। এতে যে পাছা উঁচা হয়, তোমার ভালো লাগে না। শরীরটা ত বেহুদা। আমার পোশাক হইলো আমার শরীর। আমাদের কথাগুলি হইলো আমরা। এইরকমই ভাইবা নিয়ো তুমি। যেহেতু দূর, কাছাকাছিও। চোখের দিকে তাকাইতে না তাকাইতে মাপতে থাকো কোন সাইজের ব্রা আমি পড়ি। শালার পর্ণ দেখার পরেও রিয়েল ফিলিংস লাগে! এইসব এইসব ঝাড়ি দিতে দিতে র'এর এজেন্টের সাথে লিফটের দিকে চইলা গেলা তুমি। আমি সিঁড়িতে। ভাবি,

সিঁড়ি কিরকম একটা আজব জিনিস। একই পা, একই স্পেইস। একবার সে আমারে উপ্রে নিয়া গেলো, আরেকবার নিচে।

তোমার গাড়িটা চলে গেলো। ধূলা উড়লো একটু। সন্ধ্যার আলোগুলা পড়ে থাকলো পথে।

চার পেগ খাওয়ার পরেই আমি দঈত আননাহালরে লিখতে থাকলাম দঈত আনহালাল।

এপ্রিল, ২০১৪

ফটো: দঈত আননাহাল

কিছু মায়া রহিয়া গেলো'

য়্যু আর অ্যা বাস্টার্ড, য়্যু নো দ্যাট!

শে কাইন্দা-কাইটা বলে।

আমি ভাবি, তার ভাবনা ভুলও ত হইতে পারে।

১.

- লেটস ডু ইট স্ট্রেইট। শে কইলো।

- কেন তোমার কি হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে? আমি জিজ্ঞাসা করি।

- না, আমি তোমার চোখটা দেখতে চাই। দেখতে চাই তুমি কার কথা ভাবো? আকুল হয়া বলে শে।

- আয়নার ভিতর আমি হাসার চেষ্টা করি।

- হাসির ভিতর নিজেরে লুকাইয়ো না। শে সিরিয়াস।

- লেটস ডু ইট স্ট্রেইট দ্যান। আমি তার কথাই বলি।

২.

'তাইলে কী দেখলা তুমি?' - আমি জিগাইলাম শেষে।

শে চুপ কইরা থাকলো। আমি সিগ্রেট ধরাইলাম। সিগ্রেটের গন্ধ তাঁর অপছন্দ। শে শরীরটারে ঘুরাইলো। তখনই প্রথম আমি তাঁর পিঠের তিলটা দেখতে পাইলাম। বাম কাঁধের একটু নিচে। কালো ছোট একটা বিন্দু। চামড়ার মধ্যে কিছুটা উঁচা, না ছুঁইলে বোঝা যায় না। একবার ইচ্ছা করলো সিগ্রেট দিয়া জায়গাটা ছুঁইয়া দেই। আমার এই প্রেম তারে ব্যথা দিতে পারে এই কারণে ভাবলাম যে, না, ঠোঁট রাখি। সিগ্রেট রাখলে যে ব্যথা পাইতো, তার বদলে আদর কইরা দিলাম যেন, এইরকম। ঠোঁট রাখার ভাবনার পরে মনে হইলো, দাঁত দিয়া একটা কামড় দেই, যেন খাইতে চাই ছোট্ট একটা তিল। লুচির মধ্যে কালোজিরা যেইরকম তার গন্ধ নিয়া থাকে, শরীরের তিলে তা নাই, একটা মৃদুচিহ্নই খালি।

এইটা যে শরীর, পিঠ; তারে সিগনিফাই কইরা রাখছে এই তিল। পুকুরের মধ্যে প্রাণভোমরা, দৈত্যের। আমি খুঁজতে খুঁজতে সারা শরীর ঘুইরা পিঠে গিয়া তারে পাইছি। এখন তারে চামড়ার খোলস থিকা মুক্ত করি, তাইলে কেউ না কেউ হয়তো মুক্তি পাবে। শে। অথবা আমি। তিলটাতে আমি হাত রাখতে চাই। আমি কি ছুঁইবো তারে? কেমনে? কবে? তবে বেস্টওয়ে অবভিয়াসলি গডফাদার-এর রিপিটেশন; সিগারেটের ছাইটা জমতে জমতে একটা সময় টুপ কইরা গিয়া পড়লো তিলটার ওপর। সিনেমাতে ইমেজটা পুরা ভচকাইয়া গেছে। দেয়ার শ্যুড বি এটলিস্ট একটা তিল এবং মাইকেল কর্লিয়নির হাতে-ধরা সিগ্রেটের ছাইটা কে অ্যাডামসের পিঠের তিলে পড়তেছে। ক্যান বি সাডেন, ইনসিগনিফিকেন্ট, কয়েক সেকেন্ডের একটা ব্যাপার। কারণ আর্টের ঘটনাটাই হইলো সাডেন একটা মোমেন্টের ডিটেইলিংরে দেখা এবং এড়াইয়া যাওয়ার জায়গাটাতে আসলে।

আমার এই ভাবনা যেন তাঁর শরীরে গিয়া পৌঁছাইলো। একটা হাত রাখলো শে তার পিঠের তিলের ওপর। তারপর আবার উল্টাইলো শরীরটা। হাতটা পিঠের নিচে রাইখা। চোখ বন্ধ তাঁর। শে কি মনে করতেছে, কী দেখছিলো সেইটা ভাবতেছে? নাকি ইমাজিন করতেছে এখন তাঁর আগের দেখাটারে। আমি কইলাম, হাতটা সরাও। শে তার যোনি'র ওপর থিকা হাতটা সরাইলো। একপাশে। বুকের ওপর ক্রস হয়া আছে ডান হাতটা।

ওর শরীর আমি ভালোবাসি। এমনো মনে হয় যেন শরীরের ভিতর গিয়া বইসা থাকি। ঠোঁটটা যেখানে একটু সরু হয়া ওঠছে সেইখানে বইসা শ্বাসের বাতাসে কাঁপি। রাজহাঁসের মতো লম্বা গলার মরুভূমিতে উটের পিঠে কইরা যাই। কী যে পিপাসা! কলসের গলা ধইরা পানিতে ডুব দেই। অন্ধকার চুল ধইরা ভাইসা ওঠি। প্রাসাদের ব্যালকনিতে। গোল। ঘুরতে ঘুরতে একদম উঁচাতে। ছোট্ট কালো একটা মেঘের গুহা থিকা বালুর পাহাড়ে। নরোম বৃষ্টির দিনের মতো বাতাস, ঘোঙগাইতেছে, আমার ভিতর। ঘুমাইতেছে নাকি শে?

‘হেই...ঘুমায়া গেলা নাকি? তুমি কি এতোটাই স্যাটিসফাইড?’

‘শালা, বাইনচোত...’ চোখ বন্ধ কইরাই বলে শে। আমি কি জি-¯পটে হিট করতে পারলাম নাকি? এইরকম সাফল্যবোধ হইলো! আমার পুরুষ-মন কতো অল্পতেই না খুশি হইতে পারে; এইরকম হালকা একটা ডার্টি টকিংয়ে অথবা একটা সামান্য তিলে! মনেহয় একটা ডিক টনটন করতেছে আমার মাথার ভিতরে। এই খুশি হওয়াটা সমরখান্দের মতোই একটা ব্যাপার। এইরকম বিরাট। ধ্বনিময়তাই মুখ্য আসলে, শব্দের; মিনিংয়ের চাইতে।

এবং সিনস দ্যান, আমি ভাবতে থাকি। ক্লাশ এইটের কথা। সন উনিশো অষ্টাশি। আই হার্ড ইট ফ্রম হার। ‘শালার’... এবং চিন্তিত হই যে, একজন নারী কিভাবে সামাজিকভাবে ‘শালা’ সর্ম্পকে জড়াইতে পারে অথবা এইটা কেমন গালি হয়? সম্বোধনই ত, শেষ পর্যন্ত। তবে রিয়ালিটি ইজ নট দ্য রিয়ালিটি অ্যাজ সাচ। শব্দও

খালি তা না, যা সে বলতে পারে। উচ্চারণমাত্রই সে উড়ে যাইতে পারে এবং যে অসম্পূর্ণতা সে বাতাসে ক্রিয়েট করে, ওইটুক শূন্যতারে ফিল-আপ করার লাইগা আজাইরা আজাইরা অর্থ দেয়। এই কারণে দেরিদার ডিকন্ট্রাকশন এতো আনন্দ দেয় যে এইটা নিজে নিজেই চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নার্সিসিস্ট একটা ব্যাপার হয়া দাঁড়ায়। আর শে শব্দের ভিতর থিকা খালি শব্দই জাইগা ওঠে, আরো।

'আচ্ছা, হোয়েন ডিড য়্যু ইউ ইনকাউন্টার দ্যাট যে ইউ আর স্যাডিস্ট?' হঠাৎ কইরাই শে রোমান্টিক হইতে শুরু করে।

এইটা মনে হয়, হয়। যখন খুব স্যাটিসফাইড ফিল করা যায় অথবা এরপরে বোরিং লাগতে শুরু করে, রোমান্টিকতা শুরু হইতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের এইরকম সমস্যা আছিলো। রবীন্দ্রনাথরে যাঁদের ভালোবাসতেই হইবো, তাঁদেরও এইটা আছে। এইরকম ফিলিংস যে, তাঁরা পাদ দিলেও জানি গন্ধ বাইর হয় না! পায়খানায় যায় এমনিএমনি; হাগে না। খালি দরোজাটা বন্ধ হইয়া যায়। কথা-বার্তা কয় খুব গোপন-গভীর জায়গা থিকা। অনেক মিনিংফুল, কিন্তু একদমই দরকারি না। খুবই বিশ্রী একটা ব্যাপার, এইটা! তোমার বোরিং-লাগারে তুমি আমি-অ্যাজ-অ্যান-অবজেক্ট-এর উপর চালান কইরা দিলা! এইটারে বলা যায়, ইমোশনাল চোরাচালানি। বেবি-ডলের সাথে সেক্স করাও ভালো, যদি চুদাচুদির পরে এইরকম রোমান্টিকতারে ফেইস করতে হয়। বাট আই হ্যাভ টু প্লে মাই টেগোর'স রোল অলসো! যেহেতু বাংলায় ভালোবাসি, বাংলাকে ভালোবাসি: 'যখন তোমারে হেরিলাম হে নারী'...

‘বোকাচোদা...’ থ্যাংকস; শি গেট রিড অফ হার হ্যাং-ওভার রোমান্টিসিজম।

অ্যান্ড আই গট এনক্যারেজড; ‘রসময়গুপ্তরে মারলা নাকি...’

‘ও, তাহলে ওইখান থিকা শুরু! ইউ গট স্টাক ইন দ্য রেফারেন্সেস অফ দ্য ওয়ার্ডস!’

শালার রোমান্টিকতাই ত ভালো ছিল, মওলানা যুক্তিবাদী’র থাইকা। আমি ভাবার চেষ্টা করলাম, রাস্তাটা; ফ্রম রোমান্টিসিজম টু র‍্যাশনালিজম। এত ভাবনাও আসলে ভালো না যদি না শরীর থাকে। এই পাজল থিকা বাইর হইতে হবে। আমি তাই কথা বলতে শুরু করি।

‘তুমি আসলে সত্যি সত্যিই গল্পটা শুনতে চাও?’

শে ওইঠা বসে, যেন হেইলা পড়তে চায় আমার শরীরের উপ্রে। স্টিল ইমবেলন্সের মধ্যে; তার মাথা ঝাঁকায়। আমি কই, ‘তাইলে ত তোমার চোখ খুলতে হবে, আমি দেখতে চাই তুমি কার কথা ভাবো।’

‘হা হা হা...’ কল-খোলা ট্যাপের পানির মতো শে হাইসা ওঠে। আর চোখ খুলে। আহ! শে ত চোখই নাকি! থরথরাইয়া কাঁপে, মৃদু ভূমিকম্পের মতো। কালো

দ্বীপের মুক্তা-মণি। শে ওইঠা বসে। বলে, 'ফর গডস সেইক, তোমার লোকাল টোনের ইমপ্যাক্টটা একটু কম দিও।'

আল্লারে, রোমান্টিকতা আর আমারে ছাড়বে না যেন!

৩.

ঘটনাটা রেললাইনের পাশে। বুঝলা, রেললাইন মানে ত মেডিভ্যাল ইংল্যান্ডের স্মৃতি। তথাপি শীতকাল। শীৎকারের সাথে একটা মিল আছে না! রাত বারোটা বাজে নাই তখনো। পলাশ থিকা নাইট শো দেইখা ফিরতেছি। গোরস্তান পার হইয়া ষ্টেশনে গিয়া দেখি বাল্লা লোকাল ষ্টেশনেই আছে। ট্রেন থাকা মানেই ষ্টেশনে মানুষ আছে। ট্রেন না থাকলে মানুষগুলাও ঝিমাইতে থাকে। তখন নিরবতা থাকে। ষ্টেশনের মাগিরা বইসা থাকে থার্ড লাইনের বাতিল কয়েকটা বগির ভিত্রে। কাস্টমার না পাইলে হাঁটাহাঁটি করে। আমরার মনে হয় দেরিই হইয়া গেলো আজকে। দুই চক্কর দিয়াও কাউরে পাইলাম না। শীতের বাতাস শুরু হইছে। চাদর গায়ে দিয়াও সাদী কাঁপতেছে। সে মোটামুটি চেইতাই গেলো আমার উপ্রে। সে বাড়ি চইলা যাইতে চায়। আর কেন আমি এতোক্ষণ দেরি করলাম, এইটা নিয়াও কমপ্লেইন তার। মানে, পুরা ঘটনাটা আমারই, সে খালি যোগালি মাত্র। আমি সার্চিংটা আরো কিছুক্ষণ জারি রাখতে চাইতেছিলাম। শালীরা কেউ না কেউ ত নাইট শো'টা ভাঙ্গা পর্যন্ত ওয়েট করার কথা!

পরে বিকল্প প্রস্তাব দিলাম আমি। ফিরার রোডম্যাপটা চেইঞ্জ কইরা দেখি। নিচের রাস্তা দিয়া না গিয়া, রেললাইন দিয়াই যাই। দেখি ষ্টেশনে কাস্টমার না পাইয়া কেউ আরো সামনে বাজারের পাশের বস্তিতে চইলা গেছে কিনা। ওইখানে গেলে ত আর আমরার খাওয়া নাই। কলেজের মাস্তানরা ওয়েট কইরা আছে। দুপুরবেলা সায়েন্স বিল্ডিংয়ের পিছনে বইয়া কলেজের মাইয়ারার দুধ টিপবো আর রাইত হইলে মাগি লাগাইবো, অমর প্রেম উহাদের।

রাজনৈতিক নেতারা কেন রোডম্যাপরে এতো গুরুত্ব দেন সেইদিনই প্রথম বুঝতে পারছিলাম। বেশিদূর আগাইতে হইলো না; আলগাআডির আগে যেইখানে রেললাইনটা ভাগ হয়া একটা উপরে আর আরেকটা নিচের দিকে দিয়া খাদ্যগুদামের দিক গেছে সেইখানে পাইলাম তারে। পা ফাঁক কইরা হাঁইটা যাইতেছে।

‘কই যাও?’ জিগাইলাম আমি।

‘আহ-হারে শান্তি নাই আমার! আজকা বাদ দে। বহুত কষ্ট হইছে।’

তখন আমার প্রেম আরো জাইগা ওঠছে। কেমনে বাদ দিবো! হাই কুড আই!

শীতের শুরু। কুয়াশায় ভিজে আছে ঘাসগুলা।

সাদী শালা আসলাম হয়া গেলো তখন, সুযোগ-সন্ধানী স্ট্রাইকার। কয়, আমারে অতক্ষণ ধইরা ঘুরাইতাচছ, আই উইল ইন্টার ফার্স্ট। যা শালা, তুই যখন কলেজে ওঠচছ, তুই-ই আগে যা। আমি সিগ্রেট ধরাইলাম; প্রেম যদিও কন্ট্রোল করার কোন বিষয় না, তারপরও ইট ক্যান ওয়েট। এই গ্রাউন্ডে আমি বিষয়টা মাইনা নিলাম।

মৃদু বাতাসে আমার কি রকম জানি লাগতেছিলো। আমি একবার তোমার কথা ভাবলাম, মানে তখন ত তুমি ছিলা না, ষ্টিল আই ক্যান ইমাজিন সামথিং লাইক ইউ, নট ইউর বাট অনলি, তুমি ত জানো... শে হাসলো না, তাকাইয়াই থাকলো, আমার চোখের দিকে, কারে যেন খুঁজে শে; আমার মায়ের সোনার নোলক, বাংলাদেশ যেইটা হারাইছে? হাত দিয়ো না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে, এইরকম একটা ডিসট্যান্স... আমি আর দেখি না তাই। বলতে থাকি। যদিও বলবার মতো কথা খুব কমই আছে।

সাদীর চোখের দিকেও আর তাকানো যায় না। শালা, শরমাইছে। ওর শরম আমারে সরে যাইতে বলে। আমি সামনে আগাই। প্রিন্টের কামিজটা ছিল খয়েরি। ষ্টেশন থিকা কিনা কলাগুলা পাশে রাখা ছিল। অন্ধকারে আর দেখা যায় নাই। পরে দেখা গেলো, কলাগুলা চ্যাপ্টা হয়া গেছে। আইট্টা কলা। কালো কালো বিচিগুলা বাইর হয়া রইছে। শে কান্তেছিল। আর আমাদের কাছেও কোন টাকা আছিলো না। সিনেমা দেইখাই ত সব টাকা শেষ। তাও থার্ড ক্লাশের টিকিটই কাটতে পারছিলাম আমরা। মাথা উঁচা কইরা মুনমুনের পায়ের মোটা মোটা দাবনাগুলা দেখার লাইগা।

‘এইডা কোন কাম করলি।’ শে শুধু এটুকই বলতে পারছিলো। আর আমি দ্রুত তার গন্ধ আমার শার্ট থিকা মুইছা ফেলতে চাইতেছিলাম।

আর ওইসময়ই, সাডেনলি আই ফিল দ্য ফিলিং; আমি শিওর না এই কারণেই কিনা যে, আনন্দ যা ইচ্ছার বিপরীত; অথবা একটা দুঃখ; আমি যেন শে হয়া কষ্ট পাই আর সেইটা এইরকমের শারীরিক যে এর কোন শেষ নাই; উরাতের চামড়া ছিইলা গেছে, রাতের খাওয়া নাই; যেই ফিলিংস আমার টের পাওয়ারই কথা না, আর আমি তার লোমে লোমে গিয়া বইসা আছি; দেখতেছি তার দুঃখ, আনন্দই যেইটা আমার; আমি যদি আনন্দ হয়া না থাকি, শে তো আর তার দুঃখ নিয়া নাই; কই কই ভেসে যাইতেছে, এই শরীর নিয়া; আর যদি শে বলতে পারতো তারপরও, তাইলেও শে বলতোই না। কারণ এইটা এইরকমের একস্ট্রিম, আমার জন্যও। মানে, ব্যাপারটা খালি না-দেখার না, খালি দেখাদেখিরও না; একটা সার্টেন মোমেন্ট, যেইখানে সবকিছু থাইমা যাওয়ার পরে ঘটনাগুলি আবার ঘটতেছে, আবারো শুরু হইতেছে, আবার ফিরা ফিরাই আসতেছে; একটা ঘটনা যা নিজেরে ন্যাংটা করতেছিলো কাপড় পরার সময় আর আমি সেইটার ভিতর ডুবে যাইতেছিলাম বারবার, গোত্তা খাইয়া পইড়া যাইতে যাইতে, উঠতে উঠতে আবার; ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আসতেছেই খালি, হেরোইনের চাইতেও জঘন্য; অবশ্য ইয়াবার ব্যাপারে শিওর না তখনো। কারণ তুমি ত সচেতন-মন মোর পায় না ডানা, তাই না? কিন্তু ওই মুহূর্তে না ছিল মুনমুনের পা, না ছিল টাকা না-থাকার কথা।

মানে, তোমারে আমি ঠিক বুঝাইতে পারবো না!

একটা শরীর শরীর থিকা বাইর হয়া গিয়া বইসা আছে!

আমার কণ্ঠে আবেগ টের পাইয়া শে চোখ সরাইয়া নিলো। যেহেতু মুখটা একটু ঘুরলো, তার পিঠের তিলটা আমি আবার খুঁজতে থাকি। কই গো তুমি, প্রাণভোমরা।

‘এইটা কার গল্প?’ আবেগহীন গলায় শে জিগায়।

‘নাদিমের।’ আমি বলি। উচ্চারণটা এতোটাই ¯পষ্ট যে মনে হয় গল্পটা আমারই, নাদিমের না।

‘ছোটগল্প হইছে এইটা।’ শে কইলো।

কোনরকম হাসি-করুণা-ভালবাসা ছাড়াই শে এই ঠাট্টাটা করলো। তার শরীর বেঁকে গেলো আরো। আমি স্পষ্টভাবে তার পিঠের তিলটা দেখতে পাইলাম।

আমার প্রেম নিবে গেলো।

৪.

প্রেম যে ছিল, সেইটা বলাটাও একটু মুশকিল। শি’র সাথে আমার পরিচয় কখনোই হয়া ওঠতে পারে নাই। আমি ভাবছিলাম যে, জীবনে কেউ কেউ হয়তো সেকেন্ড

চান্স পাইতে পারে। দুনিয়াতে যেহেতু নারী-পুরুষ নাম্বারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের কিছু উনিশ-বিশ আছে; কুড়ি বছর পরে, যদি না-চিনার ঘটনা ঘটে, তখন একটা কিছু ঘটতে পারে ত, একজন একস্ট্রা হিসাবেই হয়তো! এই সেকেন্ড চান্সের জায়গা থিকাই তারে আমি ইনভেন্ট করি।

শে আমারে দেখছিলো আর আমিও তারে একভাবে চিনছিলাম। আমাদের চিনা-জানা এইরকম অহেতুক একটা ব্যাপার। কলেজ লাইফে একবার একটা কনসার্টের সময় টেবিলের ওপর পাশাপাশি বসছিলাম আমরা। শে ছিল শাড়ি পড়া, বসতে কষ্ট হইতেছিল। আর কনসার্ট কাভার করতে আসা ভিডিও ক্যামেরাম্যান বারবার ক্যামেরা তাক করতেছিল তাঁর দিকে। এইটা নিয়া আমি ফ্লার্ট করতেছিলাম আমি তাঁর সাথে। শি ওয়াজ পাজলড, কোন এক কারণে। এইটার ফ্লার্ট ভাববে নাকি সিরিয়াসলি নিবে নিশ্চিত হইতে পারতেছিলো না। এই আর কী। মানে, নিশ্চয়তা যে এক ধরণের বোকামি এইটা আমরা দুইজনেই একইসাথে বুঝতে পারতেছিলাম। দ্যান উই বিকাম ফ্রেন্ডস ইন আওয়ার উইন্ডোজ।

জানালা খুলে দিলে যেমন বাতাস আসে, ধূলা-বালিও; আমরা কথা কইতে কইতে আবিষ্কার করতে থাকলাম যে, আমরা কেবল আমরা না; সায়েন্স ফিকশনের ভিতর আমরাই আছি, ক্ল্যাসিক উপন্যাসের ভিতর আমাদের কারেক্টার খুঁইজা পাই আমরা, বাংলাদেশের নাটক-সিনেমায় খুব একটা না পাইলেও বিদেশী আর্ট ফিল্মগুলাতেও আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই, প্রায়ই। আর পুরান হিন্দি সিনেমাগুলি পুরা আমাদের নিয়াই বানাইছে। বিয়া-শাদী, বাচ্চা-কাচ্চা ইত্যাদির পরে পরে। উই ক্যান

লাভ ইচ আদার অ্যান্ড ক্যান বি অ্যালোন অ্যাজ ওয়েল। মানে, পাজলড হইতে হইতে আমরা নিজেরাই পছন্দ করি ধাঁধাঁ তৈরি করা। তা নাইলে জীবন কি ও কেন ইত্যাদিতে সময় অনেক নষ্ট হয় আসলে।

একবার শে কইলো যে, হি ওয়ান্টস মি টু সাক হিজ ডিক, বাট নেভার এভার ওয়ান্ট টু টাচ মাই ক্লিটস উইথ হিজ টাঙ্ক। ন্যাস্টি জিনিস না এইটা, বলো! সে আমারে স্লেভ বানাইতে চায়, যেহেতু সে একটা স্লেভের মতো জীবন কাটায়, কর্পোরেটের। এইটুকু করুণা ত আমি করতেই পারি তারে, তাই না? শে সমর্থন চাইতে থাকে আমার। আমি চুপ থাকি। দুইটা মানুষ কি কখনোই পারে সমান উচ্চতার ভিতর দাঁড়াইতে। আই হ্যাভ নেভার এচিভ দ্যাট রিলেশন ইন মাই লাইফ। মানে, আমরাও। এইরকম সমর্থন আর দিতে পারি না, একজন একজনরে। আমাদের নিরবতা আমাদেরকে অ্যাকোমোডেড করে না আর। আটকাইয়া যাই একটা সময়। স্ক্রীণটাও ব্লার হয়া যাইতে থাকে।

আমাদেরও ক্লান্ত লাগে, মন এলায়া পড়ে; এই যে ক্লান্ত ক্লান্ত লাগে, তখন শরীর জাইগা ওঠে। দৌড়াইতে ইচ্ছা করে। শরীরের কোষে কোষে জীবন ছড়াইয়া পড়ে। উই ওয়েক অ্যাপ এগেইন, ইন আওয়ার ড্রিমস।

৫.

- লেটস ডু ইট স্ট্রেইট দ্যান। আমি বলি।

- কেন তোমার কি হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে? শে জিজ্ঞাসা করে।

- আয়নার ভিতর আমি হাসার চেষ্টা করি।

- না, আমি তোমার চোখটা দেখতে চাই। দেখতে চাই, তুমি কার কথা ভাবো? আকুল হয়া বলি আমি।

আয়নার ভিতর শে হাসার চেষ্টা করে।

- হাসির ভিতর নিজেরে লুকাইয়ো না। আমি সিরিয়াস।

- লেটস ডু ইট স্ট্রেইট দ্যান। শে আমার কথাই বলে।

৬.

আর কোন কথা না কইয়াই শে তার ওয়েবক্যামটা জানালার দিকে সরাইয়া দিলো। কমলা রংয়ের ভারী পর্দাটা সইরা গেলো। সকালের আলো আসতেছে। পর্দাটা ওড়তেছে। দূরের দালানের বারান্দায় কাপড়গুলি পতাকার মতো ওড়ে। গাছের সবুজ পাতা।

দৃশ্যটা মুছে যায়। ঘুমের ভিতর।

৭.

শিট!

রেকর্ডই করা হয় নাই!

রিয়েলি রিয়েলি বোকাচোদা হয়া আমি বইসা থাকি! কারণ প্রমাণ ছাড়া আদালত ত দূরের কথা আমি নিজেও আর কখনোই বিশ্বাস করতে পারবো না এই ঘটনা যে ঘটছিল। শে যে ছিল, তার ফুটেজ ছাড়া, অন্তঃত একটা অস্পষ্ট ইমেজ ছাড়া কেমনে সম্ভব এইটারে ঘটনার মর্যাদা দেয়া; এই ডিজিটাল রাষ্ট্রে! মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশ যে কোন ঘটনা হইতে পারলো না ওনলি বিকজ কোন ফুটেজ পাওয় গেলো না। মুসলমানরা এবং আফ্রিকানরা মাথা কুইটা মইরা গেলো, তবু ইন্ডিয়ানদের কাছ থিকা কোন ইমেজ লিক করতে পারলো না। তো, ইমেজই যখন বাস্তবতা; আমি কেমনে তারে মনে রাখবো? যেইখানে রিপ্রডাকশনের কোন পসিবিলিটি নাই, তারে উৎপাদন বলাটা যেমন, এইটা সেইরকমই একটা ব্যাপার। তাই ভুলেই গেছিলাম।

৮.

যখন দেখা হইলো আট বছর আগে একদিন, হঠাৎ কইরাই এক ফ্রেন্ডের বাসায়; শি ওয়াজ উইথ হার হ্যাজব্যান্ড অ্যান্ড উইথ হার রিয়েলি রিয়েলি প্রিটি ডটার। তাঁর চোখের দিকে তাকাইয়া দেখতে পাইলাম আমি - হৃদয়ের কামনা-ব্যথা, শরীরের নদী, নক্ষত্র, রাত্রির অগাধ বন, শাহেরজাদী, এখন সকাল, এইসব। আর দেখি, আমার চোখের দিকে তাকাইয়া আছে শে, স্ট্রেইট।

আমি ভাবার চেষ্ট করি ব্যাপারটা কী রকম না; আপনার বউ-বাচ্চা আছে, চাকরি বাকরি করেন অ্যান্ড স্টিল একজন ব্যর্থ প্রেমিক হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে থাইকা

যাইতেছেন! শে আসলে আমারে কোনদিনই ভালোবাসে নাই, হয়তো কৌতুহলী হইছিলে যে, হায় হায় এই বয়সেও মানুষ প্রেম চাইতে পারে, স্কুল-কলেজ-ইউনির্ভাসিটি-বিয়া-বাচ্চা পার হইয়া! শরীরের আর কি থাকে তখন? কেন প্রেম? জীবনানন্দের আবিষ্কারযোগ্য বিপন্ন বিস্ময় থাইকা যাওয়ার পরেও একটা শরীরের কল্পনাই শরীর থিকা কেন বাইর হইয়া যাইতে চায়?

আর একটা জিনিসটা যদি আমি ব্যাখ্যাই করতে পারি, তাইলে সেইটা ত ব্যাখ্যাই; জিনিসটা ত আর থাকে না। ভাইঙ্গা যায়। শত-হাজার-লাখ টুকরার ভিতর খালি সম্ভাবনাই, ঘটনার।

৯.

নৌকায় কইরা যাইতেছি। আমি আর শি। সন্ধ্যা হইয়া আসছে। রাস্তায় কেউ একজন কইছিলো যে, রাত এগারোটা পর্যন্ত নৌকা থাকে। কিন্তু ঘাটের রাস্তা চিনতাম না আমরা। দুইজন দুইদিক থিকা আসছি। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাসায় আইসা দেখা হইছে, কাজই ছিলো আমাদের; তারপর ফিরতেছি একসাথে। আরো একজন মেয়ে ছিলো, অফিসের; তারে রেখে আসছি, শে হয়তো অন্যভাবে আসবে বা থাইকা যাবে ওইখানেই। ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়া রাস্তা। নৌকায় আগে আরো দুইজন বসা ছিল। আমি কইলাম, আর ওয়েট না কইরা ছাইড়া দিতে; দরকার হইলে না হয় আরেকটু বেশি টাকা দিলাম। মাঝি একটু বয়স্ক। হাসলো।

সেইখান থিকা আরেক ঘাটে। আরেক নৌকায়। হাতিবান্ধায় না মনে হয়, চিলমারিতে পৌঁছাইলাম।

বাসে কইরা ঢাকা আসতেছিলাম। সারা রাস্তা ঘুম। কিছুই খেয়াল করতে পারি নাই। শি'র সাথে নৌকায় বইসা আছি। মনে আছে, এইটুকুই।

*শিরোনামটা কমলকুমার মজুমদারের কাছ থিকা নেয়া।

এপ্রিল, ২০১৪

ফটো: আনিকা শাহ

দুর্গতিনাশিনী

ব্যাপারটা স্ট্রাইক করলো এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়া; টাকা থাকার কথা ছিল, টাকা ত নাই; কিন্তু আগে থিকা কোনো আওয়াজ দেয় নাই; মেশিন ত কয় আগে, যে ভাই আপনের ত টাকা নাই, বাটন টিপেন কেন খালি, চাইলে হিসাবের কাগজ নিয়া যান। অথচ সে কিছু না কইয়া কাগজ বাইর কইরা দিলো। কাগজ পইড়াও কিছু

বোঝা যায় না; কোনো হিসাব নাই, খালি একটা লাইন, তাও মিনিংলেস, কোনো অর্থ নাই। গাণিতিক কিছু একটা লেখা, নাম্বার সাইন ইত্যাদি দিয়া। তখনই মনে হইলো, কোনো একটা গণ্ডগোল আছে এইখানে; খালি এইখানেই না অন্যান্য জায়গাগুলাতেও; যার ভিতর দিয়া এইটা ইনিশিয়েটেড হইছে। এইটাই শেষ না, মাত্র শুরু হইলো দিন। তখনো সকাল। দশটা বাজে নাই। অফিস-টাইম শুরু হয় নাই। ওহ্, অফিসে ত যাইতে হবে তাইলে।

ফেইসবুকে যেইরকম একটা ইস্যু শেষ না হইতেই আরেকটা ইস্যু চইলা আসে; ছবির হাট বন্ধের লাইগা স্ট্যাটাস দিতে না দিতেই স্পেনের পাঁচ গোল খাওয়া, তারপরে কালশীতে বিহারী পুড়াইয়া মারা, ওগো মোর জাতীয়তাবাদ, ওরা কি মানুষ না! শেষ না হইতেই মানুষ সরদার ফজলুল করিম মরলেন, যিনি নিটশে'রে সুপার-হিউম্যান ধারণার লাইগা হিটলারের বাপ ভাবছিলেন; সেইটা পার হইতে না হইতেই ইন্ডিয়ার সেকেন্ড ক্লাস টিমের সাথে বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচ হারলো, সন্ধ্যা ও বৃষ্টি একসাথে এবং পহেলা আষাঢ়ের প্যান প্যান; আর্জেন্টিনা'র খেলা··· এইরকম দুর্গতিগুলা আসতেই থাকবো একটার পরে একটা। এইরকম মনে হইলো, ঘটনাটা।

গুলশান দুই নাম্বার থিকা এক নাম্বারে যাইতে হবে। তারপর ওইখান থিকা অফিসে। মেইন রোডে ত রিকশা চলে না। মাঝে মাঝে চলতে পারে কিছু, উল্টা দিক থিকা একটা রিকশা আসতেছিল; মাঝখানের ডিভাইডারের ফাঁক দিয়া ডানপাশে চইলা যাইতেছে; বেশ একটু সামনে, অফিসের ড্রেস-পরা অবস্থায় রামপুরা বাজারে যাওয়ার সময়ের ডাক দিলাম; রিকশাওলাও চমকাইলো মনে হয়, গুলশানে তারে ত কেউ অমোন করে ডাকে না! কে এই বাদ্দাইন্মা! দেইখা সে ড্রেসের সাথে আওয়াজ মিলাইতে পারে না; কনফিউজড হয়; কিন্তু সে চলেই যেতে থাকে তার

ঘোর-লাগা কাব্যিক বাস্তবতার আরো ভিত্রে; আমার একমাত্র সম্ভাবনা, আরো দূরে···

রিকশা ত পাওয়াই যাবে। গলিতে ঢুকতে হইবো আর কি, ওয়েস্টিনের। কিন্তু আমি কেন অফিসে যাবো? আসলে ত অফিস নাই, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাইতেছি। চাকরি খুঁজতে আর ইচ্ছা করে না। এইটাই টাইনা-টুইনা চালায়া যাই, বাল। কনফিডেন্স নিয়া বইসা থাকতে ভাল্লাগে না। এতসব ইল্যুশনরে ধামাচাপা দিয়া কদ্দূর যাবো আমি? আমি ত জানি না। আর জানা-বোঝা'র দুনিয়া খুবই আজাইরা লাগে এবং এইসব আজাইরা-আজাইরা ভাবা'র ভিতর দিয়া আমি যে কাব্য-ভাব'টা ধইরা রাখতে পারি, ঠাকুর বা ফকিরও সেইটা পারতো কিনা সন্দেহ। তাইলে কেন আমি কনফিডেন্ট হইবো, বাউন্ডারির বাইরে গিয়া এমন প্রশ্ন কেন জিগাইবো না যাতে এমন একটা জায়গা এচিভ করতে পারি যে, আমি জানি না; এইবার তোমরাই বলো। অথচ সেইটা আর হয় না। অথরিটি হয়া উঠার চাইতে অথরিটিরে ভাইঙা দিতেই ত যত আনন্দ এবং যে কোনো ইন্টারভিউ'র উত্তর আসলে প্রশ্নকারীরে সন্তুষ্ট করাই শেষ পর্যন্ত, প্রশ্নটা কী চাইতেছে সেইটারে গেইস করতে পারার পলিটিক্যাল ঘটনাই। সো, হাউ কুড আই আনসার দ্যাট? অথরিটিরে ত প্রশ্ন করা যায় না, বাতিল-ই করা যায়। আর সেইটা করতে গেলে বাস্তিলে স্যাড হয়া পইড়া থাকতে হবে, মরা'র আগ পর্যন্ত।

মরা'র ঘটনাটা আসলে ঘটে খুব ধীরে ধীরে। সেইরকম ধীর-প্রবণ অসুখ শুরু হইছে। ইন্টারভিউ দিতে না গিয়া সুমনের কাছে গেলাম। সুমন কয়, তর যে দাঁতে ব্যথা, ওইটা ত আর আগে কছ নাই! ওরে একটু চিন্তিত মনে হইলো। আমিও চিন্তায় পড়লাম। দাঁতে ব্যথা নিয়া আমি সুমনের কাছে কেন আসছি? ও ত মেডিসিনের ডাক্তার। আমার ত যাওয়ার কথা মাসুদের কাছে, ডেন্টিস্ট, ঝিগাতলায়। খালি ভাবি

যে যামু; যাই না আর। সুমন কইলো, তুই ব, আমি একটু আইতাছি। দেখি, একটা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় বইসা ছিলাম আমরা। গ্লাসের দরজা দিয়া বাইরেটা দেখা যায়। আমি সুমন হয়া পাশের বিল্ডিংয়ে যাই আর সাথে সাথেই নাইমা আসি এক মঙ্গোলয়েড বুড়ার সাথে কথা কইতে কইতে। ওই ব্যাটা মনে হয় আরো বড় ডাক্তার, প্রফেসার অথবা কনফুসিয়াস। ওর সাথে আরো সঙ্গ-পাঙ্গ, লোকজন। এর মধ্যে কনফুসিয়াস সুমনের সাথেই কথা কয়। কিছুক্ষণ পরে, কনফুসিয়াস টয়োটার একটা সেডানে কইরা চইলা যায়। সুমন আবার ঢুকলে সুমন হয়া যায়। আমি কই, কি রে কী কইলো? সুমন কনফিডেন্ট থাকার চেষ্টা করে ওর কনফিউশনগুলা নিয়া। কয়, এই ঔষুধ খাইবি, ওইটা খাইবি না; এইরকম। কিন্তু মরা নিয়া কিছু কয় না। মরতে হইলে ত পিজি, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদিতে যাইতে হইবো, খালি ওর চেম্বারে গেলে হইবো নাকি, আমি ভাবি। আর টাকা থাকলে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, এটলিস্ট ইন্ডিয়া। আমার সব চেত গিয়া পড়লো, সুমনের উপ্রে। সুমন হইলো অমনোযোগী ডাক্তার। ও রিসার্চ-টিসার্চ করলে ঠিক আছিলো। প্র্যাকটিসেও ঠিক আছে; কিন্তু বন্ধুদের কাছে আসলেই অমনোযোগী হয়া যাই; ডাক্তারি গাম্ভীর্য আর রাখতে পারি না। ডাক্তারি পেশাতে গাম্ভীর্য ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড; যে যত বড় গাম্ভীর্য, সে তত বড় ডাক্তার। আমার আর ভাল্লাগে না।

আমি চাই অন্য কোথাও চইলা যাইতে। অন্য কোনো দুনিয়ায়। মাইগ্রেট করতে পারলেও ত হয়। কানাডায়। ওইখানে জীবন নাকি আরো কঠিন। বরফ এবং শীত। আমি ভাবি এস্কেইপের কথা; পরে আবার একটু এডিট করি, শীত না হয়তো, কোনো হেমন্তে। কিন্তু সেইখানে, দশকে দশকে কবিরা আকুল, তারা পাতা হয়া পাতা-ঝরাদের কবিতা লেখে:

ত্রিভুবনে কেউ আর নাই/সাময়িক হয়া ঝুলতেছে/গাছে গাছে সবাই

যে যে পাতা ঝরে যায়/তা তা দেইখা হাসে/যে যে পাতা ঝরে নাই

কিছু কিছু পাতা/এইরকমও ভাবে,/চুদাচুদি-ছাড়া পাতারা কেমনে জন্মাই?

কবিতাতেও বিরক্তি আসে। এখন হইলো কবিদের গদ্য লিখার টাইম, বুঝলা? কবিতা আর লিখতে না পাইরা আল মাহমুদ সাজেশন দেন। উনি কবিতার সাথে গল্পরে মিলাইতে না পাইরা, কবিদের গল্পকার বানাইতে চাইছেন। ওই ট্রাডিশ্যানরে ডিঙাইতে হইবো একটু একটু মাইনা না-মানার ভিতর দিয়া, নাইলে তুমি কিয়ের ইন্ডিভিজ্যুয়াল ট্যালেন্ট! এই টান্ডলামি নিয়া সমাজবিজ্ঞানী সেরের উপ্রে সোয়া সের জোড়া দেন; জীবনে যেই যেই কাজকাম করেন, সেই সেই কাজকাম নিয়া গল্প-কবিতা-সাহিত্য লিখেন না কেন আপনারা? হাগা-মুতা বাদ দিয়া একটা দিন কি পার করছেন আপনে, অথচ আপনার কবিতায় বা গল্পে হাগা-মুতা'র স্থান কোথায়? উল্লেখই নাই! খাওয়া-খাদ্য রান্ধনের কথা না হয় বাদই রাখলাম। এটলিস্ট করলা ভাজি নিয়াও একটা গল্প কি লিখতে পারতেন না আপনারা! এইরকম রিয়ালিটি বাদ দিয়া সাহিত্য করলে কেমনে হবে, বলেন? একটা তক্ষক থাকতে থাকে তখন, আইবিএ'র গ্যারাজে। আপনে যেমনে ডাকবেন, সেও একইভাবে ডাকতে থাকবে, যতবার আপনি ডাকবেন; মইরা গেলেও সে তার ডাক থামাইতে পারবে না, যদি আপনি না থামেন। রিপিটেশন ইজ লাইফ। তুমি হেমন্তের কাছে গিয়া কী করবা, হেমন্তই বারবার আসতে থাকবো। তুমি খালি চোখ বন্ধ কইরা চায়া থাকো! আর তখনই দেখি একটা পরিষ্কার পাত্র তার পানি-জল খাইতে শুরু করছে আবার। অল্প-বয়সের কবি বেশি-বয়সের মহত্ব আবিষ্কার করতে থাকেন। বেশি বয়সের কবি তব্দা

মাইরা বইসা থাকেন। তাই তো, তাইতো চিবাইতে থাকেন। প্রতিবছর হেমন্তে, পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি ঝরিয়া পড়েন, বইমেলা আসতে না আসতেই। উনাদের হাসি হাসি রাশি রাশি কথার ভিতর মধু জমতে থাকে, সুন্দরবনের।

অল্প-বয়সের ম্যাচুরিটি আর বেশি-বয়সের নাদানিতে ভাসতে ভাসতে আমি চইলা আসি আবার, ভেজাল-দুনিয়ায়, ফরমালিনের। আইসা পড়ি, শি'র সামনে। উহারে আমি বলি, আমার বেদনারে তুমি দশ হাত দিয়া সামলাও! সে খালি উপচাইয়া পইড়া যাইতে চায়। সে দেখে, এইসব আজাইরা কথার কিছুই শুনে না। তারপরে কনভারসেশন হয়।

হেঁটেই নামলেন?

হ্যাঁ। লিফটে নামতে গেলেও একই সময় লাগে। হাঁটাটাই বেটার।

হুম। নামা যায়, কিন্তু ওঠা যায় না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠতে গেলে সমস্যা হয়।

পাঁচতলা পর্যন্ত পারা যায়।

হ্যাঁ, পাঁচতলা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম। এর পরে উঠতে গেলে, হার্ট ধুঁকফুঁক করে।

ধুঁকফুঁক শব্দটাতে কনভারসেশন আটকাইয়া যায়। আমার হার্ট কি পাঁচ থিকা ছয়তলা পর্যন্ত যাইতে পারবে না আর?

অসুখ নিয়া চিন্তাটা হয়তো ফিরা আসবে এখন। নাকি এটিএমে গিয়াই আবার ট্রাই কইরা দেখবো? পায়রা নদীতে তখন, বরিশালে, কি যে ঢেউ, এর উপ্রে আবার বৃষ্টি। স্বরূপকাঠিতে, সন্ধ্যা নদীর খালে গিয়া মনে হয় যেন তামিলনাড়ুতে আসছি, ঘুরতে। বর্ষাটা কোনোরকম পার করতে পারলেই হয়, আল্লা বাঁচাইলে কোথাও দুর্গা আসিতেছেন নিশ্চয়ই। দুর্গতিনাশিনী।

জুন ২০১৪

ফটো: দঈত আননাহাল

নিম তিতা নিশিন্দা তিতা

‘তোমার জামাই তোমারে ভাঁজ দিলো আর তুমি প্যাঁচ খায়া গেলা!’

‘তুমি জানো, ইটস নট ট্রু! তুমি একটা বাজে লোক আমি জানি, কিন্তু এই সময়ে আমারে ডিসট্রাক্ট করাটা অন্তঃত স্টপ করো!’

‘তোমারে যদি আমি ডিসট্রাক্টই না করতে পারি তাইলে তোমারে আমি কেমনে ভালোবাসবো? তোমারে ত আমি আমার ইলিউশনের মধ্যে নিয়া যাইতে চাই। সেইখানে তুমি বন্দী রাজকন্যা আর আমি রানা প্লাজার উদ্ধারকর্মী। দেখো, একটা রিলেশনের কাজই হইলো একটা ইলিউশনরে সম্ভব কইরা তোলা। যাতে কইরা এর ভিতরে আমরা নিজেদরেকে আটাইতে পারি। এখন সুমন পারতেছে। কারণ সে তোমারে কনভিন্স করার লাইগা টাইম পাইছে। তোমরা একই প্যানে হাগা-মুতা করো। আমি ত বাল তোমার চুলের গন্ধটাও ভুলে গেছি। বিশদিন পরে পরে একটা ঘন্টা খালি; তোমার সাথে এইটুক সময়ের মধ্যেই আমি শেষ। সুমন রে সুমন!’ নিম আর হাসে না। শে তার কাপড় পড়তে শুরু করে।

একই ট্রিকস বারবার কাজ করে না আসলে। প্রথম প্রথম আমরা সুমনরে নিয়া হাসতাম। কুত্তা-বিলাই নিয়া যেমন আমি হাসতে পারি, মানুষ নিয়াও পারি যে সে আসলে মানুষ না তেমন একটা। কোনকিছুরে তার অ্যাকজেগট অবস্থা থিকা রিডিউস না করা গেলে ত হাসা যায় না। এইটা একটা চালাকি ওরে ইগনোর করার, ইস্যুটারে হালকা কইরা ফেলা। কিন্তু চালাকিটা হইলো প্রেমের শত্রু। সুমন আমাদের কাছে বোকা থাকতে থাকতে জিইতা যাইতেছে। আই ক্যানট প্রুভ যে, আমি আরো বড় বেক্কল। আমার আত্মা বেইচা দিছি আমি খামাকা ফ্লার্ট করতে গিয়া। আমি রিয়েল প্রেমিক হইতে চাইতেছি আর ওরে বাইন্ধা ফেলতে চাইতেছি

এইভাবে আমার ভাবনার ভিতরে; আর নিজেও আটকাইয়া যাইতেছি। রিয়ালিটির কি যে যন্ত্রণা, কারণ রিয়ালিটি কনসেপ্টটা কখনোই প্লুরাল হইতে পারে না, অথচ আমাদের কল্পনায় কতকিছুই না সাজাইতেছি আমরা।

এইটা খুবই ভয়ংকর একটা গেইম। আমি জানতাম। আমারে মাসুদ রানা হইতে হবে; টানে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না... কিন্তু আমি হইলাম জাস্ট রিভার্স; বাঁধনে জড়াইতে চায়, কিন্তু টানতে পারে না... ইন দ্যাট কেইস নিশিন্দা হইলো গিয়া বেক্কল'টা। শি নোটিসড যে, আমি পারি না এবং আমার বোকামি'র সাথে তার বোকামিটারে মিলাইয়া ভজঘট'টা পাকাইলো। যে, রিয়ালিটি এগজিস্ট! আরে, আমি ত প্রেমে পড়তেই পারি। কোনকিছু না জাইনা এবং না বুইঝা। বেক্কল হিসাবে এইটা আমার অভ্যাস, আমার কোয়ালিটি। ওরও যে কোন কুক্ষণে নিজেরে বেক্কল প্রুভ করার লাইগা উতলা হইতে হইলো, আল্লা জানে!

নিম আর সুমন হইলো হাইস্কুল সুইটহার্ট। ক্লাশ নাইনে থাকতে সুমন যখন ওরে প্রপোজ করে, তার আগে থিকাই শে সুমনরে খেয়াল করতো। ঠিকই ছিল এইসব। একটা সময় আমি ভাবি, শে নিশ্চয় সুমনরে কইতো, 'একটা লোক আছে ইতর টাইপের; আমার দিকে কেমনে জানি তাকাইয়া থাকে; দেখলেই কেমনে গা ঘিন ঘিন করে আমার!' বইলা শে তার শরীরটা আরেকটু ঠেইলা দিতো সুমনের দিকে। ফিলিংসটারে মোর বিশ্বাসযোগ্য করার লাইগা। আমি ভাবি এইসব। হইতেই পারে। কে জানে, আমি কি নিশিন্দার কথা কইছি নাকি নিমরে; যে শে আমারে সুমনের কথা কইবো।

গল্পের ভিত্রে আমি একটা কঠিন ভিলেন। বাজে লোক। আমার বউ সিদাসাধা, ইনোসেন্ট; মেয়ে আর জামাই ছাড়া কিছু জানে না বা জানতে চায় না। ছোট মেয়েটা মারা যাওয়ার পরে বড় মেয়েটারে নিয়াই সারাদিন থাকে। ফেইসবুক দেখলেই সন্দেহ করে। অন্যদিকে ছেলেটা হইলো নিশিন্দার জান। সুমন বা আমি দুইজনেই ধইনচা আসলে। নিশিন্দা তার মা-হওয়াটারেই মেয়ে হওয়া ভাইবা নিতে পারছে। আর এইটা শে কোনভাবেই ছাড়তে রাজি না। এখন পোলার লাইফ সিকিওরড করার লাইগা আবার সুমনরে ধরছে। আমি যে বাজে লোক সেইটা আমার এই ভাবনাটা রিকমফার্ম করে আবার। কারণ ওরা ত এমনিতেই নাইস কাপল!

মাঝখান দিয়া আমি, কাবাব মে হাড্ডি। এখন শুয়া শুয়া আপনার ধোন হাতাই। গান শুনি। বিরহ বড় ভালো লাগে; শচীনকর্তা, জীবনে যিনি সবই পাইছেন, গাইতেছেন এখন, আমার মোবাইলে।

এই গল্পের নারীরা ছিলো সবাই সিংহরাশির জাতিকা। কিন্তু রাশি যা-ই হোক, এত এত কনফিডেন্ট এরা! আমি অর্থাৎ নায়কের বেকুব হওয়া ছাড়া আর কোন পথই থাকে না। তবে ঝামেলাটা বাঁধে নিম আর নিশিন্দার বার্থডে নিয়া। অগাস্টেই জন্ম ওদের। আট না নয় তারিখ জানি। সারাক্ষণই বিভ্রান্তি হয়। কে অতীত আর কে ভবিষ্যত? যেহেতু বর্তমান একটা শূণ্যস্থানের গর্ত, এইরকম একটা ধারণার ভিতর আমি পার হইতে থাকি। আমি আসলে কার সাথে কথা কই? অবশ্য এমনো হইতে

পারে যে, ওরা মিউচুয়্যালি এক্সক্লুসিভ সত্তা, একজন থাকলে আরেকজন থাকতে পারে না বা একজন আসলে আরেকজনই। ওরা আসলে দুইজন না, মেবি কয়েকজন।

বা নিম যদি নিশিন্দা হইতে পারে, আমিও ত তাইলে হইতে পারি আরেকটা কিছু। অ্যাজিউম করতে করতে আগাই আমি। আমি কি রাসেল হইতে পারি না, পর্ণার ভাই?

রেললাইনের স্লিপারে পা রাখতে রাখতে হাঁইটা যাই, স্কুল শেষে। একটু পিছে পিছে কাঁচুমাচু কইরা হাঁটি। বড়ভাই ত পাড়ার মাস্তান। কিন্তু আমি খেলাঘর করতে চাই। পর্ণাপার প্রেমিকের মতো হইতে চাই। চাওয়ার ভিতর হারাইয়া যাই একদিন। আর ফিরা আসি না। কোথাও কোন ঘাসের ভিতর ঘাসপোকা হয়া আটকাইয়া যাই। নাকি, কলেজের মাস্টার, ইকনোমিকস পড়াই। কালা একজন মানুষ। সুস্থ-সবল। হাসি দিয়া গায়ের রং লুকাই। শ্যামলা একজন বউ আছেন। ততোধিক সুন্দর একটা হাসির মতোন। মিশুক। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ওরাও সুস্থ-সবল, হাসি-খুশি। ফিজিক্যালি বা মেন্টালি চ্যালেঞ্জের কোন ঘটনাই নাই। তারপর আট বছর আগে একদিন। ঘুমানোর আগে রাতের বেলায় স্ট্রোক কইরা মারা যাই। হায় হায় এখন ত অনেক কষ্ট কইরাও নিজেরে চিনতে পারি না। কি নাম ছিল আমার? নাম ছাড়া কোন মানুষ হয় নাকি? নামটাই তো হইলো মানুষ।

নাম আছে বইলাই নিমের কথা ভাবতে পারি আমি। নিমের যখন বিয়া হয়া গেলো তখন খুব খারাপ লাগছিলো আমার। নারকোল গাছের পাতার মতোন দীর্ঘ বিকাল জানি ঘরের দরজায় আইসা বইসা আছে। এইটা কোন ঘটনাই না। নারকোল পাতাটা বুঝতেছে। আমি বুঝতে পারতেছি না। কেন আমরা পর¯পর সম্পর্কের দড়িতে ঝুইলা যাই। এইটা পলিগ্যামির কোন বিষাদ বা মনোগ্যামির আর্তনাদ না। একটা এম্পটি স্পেইস যেইখানে ইন্ডিভিজ্যুয়াল তার ইন্ডিভিজ্যুয়ালিটি নিয়া থরথর, কাঁপতে থাকে খালি। বিপদে মোরে রক্ষা করো, বিপদে যেন না আমি পড়ি! এইরকম। কারণ বিপদ তখন আবারো শুরু হয়া গেছে।

কনভারসেশনটা শুরু হয় আবার।

‘এতো মিথ্যা কথা তুমি কেমনে বলো! সত্যর প্যাঁচ দিয়া তুমি এমন ভাব করো যে, মিথ্যাগুলা আসলে মিথ্যা না, এরা জানি সত্যি। এইভাবে, সত্যিকার অর্থে তুমি কি এচিভ করতে চাও? তুমি কি প্রমাণ করতে চাও যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরের সত্যি এবং মিথ্যাগুলি চুদাচুদির সময়ের দুইটা শরীরের মতো, যে আলাদা করা যায় না? যার যার যৌন অঙ্গগুলাতে আটকাইয়া গেছে? আসলে তুমি নিজেই পুরাটা ফাকড-আপ। তোমার নিজের ঝামেলার ঝাল তুমি আমার উপরে ঢাইলো না।’

‘আমি মোটেই সেইটা করতেছি না। বরং তুমি নিজেরে দিয়া আমারে ডিফাইন করতেছো। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে একটা জিনিস সত্য অথবা মিথ্যা-ই; এইখানে গ্রে কালারের আবিষ্কার আসলে ঘটনাটারে কাঁপাকাঁপি করা কোন গ্রাউন্ডে

নিয়া যাওয়া, মৃদু মৃদু ভূমিকম্পের মতো, ট্রেনের ঝিকঝিক ঝিকঝিক শব্দের ভিতর মনোটোনাস কইরা তোলা; যাতে আমরা ভুলগুলা করতে পারি ইজিলি। এর বেশি আর কোন রহস্য এইখানে নাই। মানুষ আসলে যা, মানুষ আসলে তা-ই; যা তা একদম। বুঝলা? এইখানে আমি আমারে ডিফেন্ড করতেছি না, বরং তোমারে সেইভ করতে চাইতেছি, তুমি নিজেরে ঠকাইও না যে, তোমার ছেলে'র লাইগা তুমি এইটা করতেছো! এইটাই তুমি, যে পালাইতে চাও, প্রেমরে প্রতারণা ভাইবা শেষে ট্রেনের নিচে চইলা যাও; আন্না কারেনিনা!'

'প্রেমের ত শেষ আছে! তুমি ভালো কইরাই সেইটা জানো। তোমার বিভ্রান্তির ভিতর খামাখা তারে চিরজীবী কমরেড ফরহাদ বানাইয়ো না।'

আমি টোনটারে টেম্পারড করার চেষ্টা করি তখন। মিনমিন বিলাইয়ের মতো, একটা ফেরেশতার মতো কথা বলার চেষ্টা করি।

'আই অ্যাম নট ডান উইথ ইউ। আর তুমিও সেইটা জানো। তুমি ভয় পাও, যদি তুমি সত্যি সত্যি আটকাইয়া যাও। এই রিয়ালিটিরে তুমি মনে করো, ডুয়াল। ডুয়ালিটির বাক্সবন্দী জীবন থিকা তুমি মুক্ত হইতে চাও। কিন্তু ব্যাপারটা এট্টুকই না। তোমার মোরালিটি দিয়া তুমি তোমার লাইফরে আটকাইয়া ফেলতে পারো না। আর তুমি সেইটা জানো। এই কারণেই চিৎকার করতেছো, যাতে তুমি তোমার আবেগ দিয়া, ইনটেন্স দিয়া অস্বীকার কইরা ফেলতে পারো।'

‘আর তুমি কি ভাবো যে তোমার রিভার্স ইনটেন্স দিয়া তুমি পার পায়া যাবা?’

‘নাহ! মাঝে-মধ্যে ক্লান্ত লাগে আর কি। এই যে এত এত কথা, সবই ত মিনিংলেস, তাই না?’

‘তুমি কি তাইলে এতোটাই ডেসপারেড? আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার ফন্দিটা কি বলো?’

আমি কেমনে বলি! সত্যি এমন একটা পাত্থর যা সিসিফাসও তুলতে পারে না। পারলেও সে গড়াইয়া গড়াইয়া পইড়া যায়। তাই কথা না বলি আর। কিন্তু একটা কিছু ত বলা লাগবে আমারে। আমি কি বলি তারে? যে কোন উচ্চারণই সত্যি এখন। এই মোমেন্টে।

‘আমার বিভ্রান্তিরে তুমি খামাখা গ্লোরিফাই কইরো না!’

অ্যান্ড বলার পরেই বুঝতে পারি, কি ভুল আমি করলাম! ওইটা ছিল ওভারের লাস্ট বল। শর্টপিচ ধরণের। তার পুরা শক্তি দিয়া শটটা খেললো শে। যদিও এক রান নিলেই শে জিততে পারতো। কিন্তু শে ছক্কাই পিটাইলো। এতোটাই অ্যাডামেন্ট শে, তার অস্তিত্বের লাগি। জান কোরবান। কি যে এক মুহূর্তের হাসি। শে বুঝে। আর আমি বুঝি।

‘তাইলে তুমি বলো, আমি কে, নিম না নিশিন্দা!’

এইটা ওর পুরান খেলা। নরমালি আমি বলি যে, তুমি বাঁধন, নিরবতার উপ্রে কস্টেপ আমার! আর জড়াইয়া ধরি তারে। কিন্তু এখন আর এইটা সম্ভব না, এই খেলার ভিতর আমরা পুরানারে আর ডাইকা আনতে পারি না। টাইম ইজ ওভার নাউ। একটা মুহূর্তের ভিতর আমরা আটকাইয়া যাই। ট্রাপড ইন আওয়ার অউন ট্রান্সলেশন।

‘আর সময় তুমি পাবা না, চান্দু’; নিম বলে, নিশিন্দা বলে, বাঁধন-হারা হয়া।

তারপর চইলা যাইতে থাকে শে। শ্যাওলা-রঙের একটা জামা পইড়া।

জুলাই ২০১৪

ওয়ার অ্যান্ড পিস

ইলাস্ট্রেশন: খেয়া মেজবা

ছিলাম অফিসের একটা উইকলি মিটিংয়ে। মিটিংরুমে আমার ঢুকতে একটু দেরিই হইছিল। অফিসে গেছি দেরিতে। তারপর ভাবলাম যে ডেস্ক থিকা ল্যাপটপটা নিয়াই যাই। কেউ না কইলেও, মিটিং মিনিটস লিখতে পারা একটা অ্যাডিশন্যাল সুবিধার ব্যাপার; যেহেতু লিখতে হয়, এই কারণে কথা-বার্তা একটু কম শুনলেও হয়।

এমন না যে, কথা-বার্তা শোনাটা ইম্পর্টেন্ট না; যা লিখতে হইবো, ওইটুক শুনলেই হয়। মানুষজনের ইন্ডিভিজ্যুয়াল পারসপেক্টিভগুলা এবং পারসেপক্টিভের ভিতরে উনারাদের মিনিংগুলা না শুনলেও হয় আর কী। মানে, শোনাই যায় না তখন, টাইমই পাওয়া যায় না; একটা পরে একটা আসতেই থাকে। লিখবো না শুনবো এইরকম একটা ব্যাপার। মনোটোনাস লাগে এই রেট-রেস। একটা প্রমোশনই ত, এর লাইগা বুদ্ধির এতো এতো টেকনিক। ভাবতেই ক্লান্ত লাগে। মিনিটস নিতে কিছু ভুলও হয়, পারসপেক্টিভগুলা ঠিকমতো আর্টিকুলেট না করতে পারলে। কিছু ভুল থাকাটা মনে হয় ভালো। আল্লার দুনিয়ায় পারফেক্ট আর কে হইতে চায়, সবাই ত চায় ডিজায়ারেবল হইতে, কনশাস কিছু ভুলসহ। কারণ যে ভুল ধরতে পারলো, সে ভালোও বাসতে পারে ত, একটু। এইরকম সম্ভাবনাগুলা না রাইখা দিতে পারলে, বাঁইচা থাকা কেন আর! এইরকম মনে হয়, মাঝে-মধ্যেই। আমাদের বাস্তবতা এইসব ঠেসগুলারে অ্যাকোমোডেড কইরাই চলে, কোন না কোন ভাবে; এইটা বেসিক পয়েন্ট না অবশ্যই, কিন্তু একটা পয়েন্ট ত!

আমি যাওয়ার পরে একটা পয়েন্টই আলাপ হইলো। তারপরই শেষ-শেষ ভাব। স্পিকার ত বস একলাই। বাকি আট-দশজন মুড বুইঝা খালি হুঁ-হা করে। যেই ঈদ

গিফটগুলা পাঠানো হইবো, সেই অ্যাড্রেসগুলা একটা এক্সেল ফাইলে রাইখা দিতে কইলেন। যে, কে কে কারে কারে কয়টা কইরা গিফট পাঠাইতেছে, এইটা ডকুমেন্টেট থাকাটা দরকার। যদিও মাইনর ইস্যু, কিন্তু এইরকম মাইনর ইস্যুতেও অডিট হইলে যাতে কোন ঝামেলা না হয় বা পরবর্তীতে নানান কাজে লাগতে পারে। কাজটা যে কারে করতে বললেন, আমারে নাকি শেরিল'রে ঠিক বুঝতে পারা গেলো না। শেরিল চোখের কোণা দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসলো, মানে, এইটা ত আপনারেই করা লাগবো! কাজকাম কইরা প্রমোশন যেহেতু চান আপনি। আর শেরিল জানে, প্রমোশন একটা ডিফরেন্ট গেইম। আমি সেইটা শিখতে পারি নাই। এখন মিড-এইজে আইসা নতুন কইরা শিখারও উপায় নাই। সিনসিয়ারিটি, ডেডিকেশন ইত্যাদি মানবিক গুণাবলী, যা ছিল সিক্সটিইজের ইনোভেশন; এইগুলা বেইচাই চাকরি টিকাইয়া রাখতে হবে।

শেরিলের এইসব না করলেও চলে যেন। ও মনে হয়, স্যান্ডবার্গের লিন ইন বইটা পুরাটাই পইড়া ফেলছে, আমি ভাবি। ভাবি যে, কেন আমি আরো লিবারাল হইতে পারি না, নারী বিষয়ে।

প্রতিবার উইকলি মিটিং শেষে এইরকম পরাজয়ের একটা ফিলিংস হয়। কাফকার মতো লাগে নিজেরে, অফিসে। (এই মনে হইতে পারাটা একটু রিলিফ দেয়।) আছি, কিন্তু থাকাটার সবসময় ভিতর না-থাকাই থাইকা যাইতেছে। সিনসিয়ারিটি, ডেডিকেশন আছে, কিন্তু আমি ত নাই! এইরকম হযবরল থাকা নিয়া কি তরুণ-কবিদের ওপর আস্থা রাখাটা ঠিক হবে? বড়জোর আরেকটা অ্যাভারেজ গল্পই লেখা

যাবে, ঈদসংখ্যার৷ বিশ হাজার মানুষ দেখছে বইলা ভাইবা আনন্দ পাওয়া যাবে, ফেইসবুকের নোটে শেয়ার করলে অন্তঃত বিশটা আইডি'র লাইক পাওয়া যাবে যাতে কইরা প্রমাণযোগ্য করা যাবে গল্পটা ভালোই হইছে৷ আর এর লাইগা আমি আমার জীবন পগার পার কইরা রসাতলে যাইতে থাকবো! কাভি নেহি! এইরকম একটা জিহাদি জোশ চইলা আসলো শরীরে৷ অফিসে বইসা জিহাদ করা সম্ভব না; সম্ভব, তবে অনলাইনে৷ এইগুলা দিয়া হবে না৷ পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ হইতে হইলে রাস্তায় নামতে হবে৷ সাহিত্য দিয়া এইরকম রাজনীতি কইরা ফেলা থিকা কখোন যে বাইর হইতে পারবো৷

অফিস থিকা বাইর হয়া আসলাম৷ হাঁটতে হাঁটতে ঘাটে আসছি৷ পার হয়া যাবো; অ-পারে থাকবো না আর৷ ফেরিও আছে ঘাটে৷ ছাড়তে এখনো দেরি আছে৷ একটা সিগারেট ধরানোর কথা ভাবলাম৷ নদীরপাড়ে আসলে ত এমনিতেই সিগারেট খাইতে হয়৷ এইটা গল্পে বইলা রাখাটা দরকার যে, চরিত্রের প্রয়োজনে এই সিগারেট খাওয়া ব্যাপারটা আসছে, এমনিতে সিগারেটের প্যাকেটে লেখা আছে: সিগারেট খাইলে ক্যান্সার হয়; হিন্দিতে ক্যান্সাররে ওরা কর্করোগ বলে৷ কী আজিব, এই ভাষা-প্রক্রিয়া৷ এইরকম অনিশ্চয়তায় দাঁড়াইয়া আছি যখন, এমন সময় দেখি ইকবাল ভাই আর মনির মামা আসতেছেন৷ উনাদের দুইজন এখনো তরুণ৷ আমার সমান বয়সই উনাদের৷ একটা বয়সের পরে বয়স আসলে বাড়তে পারে না৷ আমি যখন ছোট আছিলাম, তখনো উনারা একইরকম বয়সের আছিলেন৷ একইরকম আছেন অনেক দিন ধইরা৷ বাজার থিকা আসছেন মনে হয়৷ বাড়িতে যাইবেন৷ একটু তাড়াতাড়ি'র মধ্যেই আছেন উনারা৷ আমারে দেইখা ইকবাল ভাই হাসলেন৷

মনিরমামা কইলেন, 'কিও, তুমি এইখানে দাঁড়াইয়া কি কর? যাইবা না?' আর এই কমিউনিকেশনের কারণে তখনই মনে হইলো; আরে, আমার মোবাইলটা কই! অফিসে ফেলে আসছি! তাইলে ত আবার অফিসে যাইতে হবে। উনারা এইটা বুঝতে পারলেন। যে, আমি এইবার যাইতে পারবো না।

ফেরিটা ছাইড়া দেয়ার পর বুঝতে পারলাম, বেশ ছোট ছিল ফেরিটা। একটা মাইক্রোবাস আর একটা প্রাইভেট কার ছিল। আর উনারা দুইজন-ইকবাল ভাই আর মনির মামা। চইলা যাইতে থাকলেন। ধীরে ধীরে।

উনাদের তাড়াহুড়াটা তখনো বুঝতে পারি নাই। অফিসে ফেরত যাওয়ার পথে দেখি কেউ নাই। এইরকম ফাঁকা, বিকালবেলাতেই? সন্ধ্যাও ত হয় নাই! তখনো আমি বুঝতে পারি নাই যে, ধর্মযুদ্ধটা শুরু হয়া গেছে। কিন্তু ফিলিংসটা হইতেছিল। অফিস আর নাই, ছোট ছোট কাজের বড় বড় ব্যস্ততা নাই। মোবাইল ফোনেরও আর দরকার নাই এখন। আমাদের বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়াই নিজেদেরকে বাঁচাইতে হবে এখন। এইবারের সংগ্রাম এগজিসটেন্সের সংগ্রাম! এই সংগ্রাম নিজে বাঁচলে বাপের নামের সংগ্রাম!

ধর্মযুদ্ধটা যে শুরু হবে, এইটা অনেকেই অ্যাজিউম করছিল। হঠাৎ কইরা যখন শুরু হয়া গেলো, তখন দেখা গেলো, জানলেও, নিজেদের কথা আসলে তখন নিজেরাই অনেকে বিশ্বাস করে নাই। ভাবছিলো যে, এইভাবে বলতে বলতে হয়তো আটকাইয়া ফেলা যাবে, ঘটনাটারে। যাঁরা জানতেন, আমি তাদের দলে

ছিলাম না। উনাদের তো জানারই কথা, সো উনারা জানতেন। আমার ধারণা, এইটা উনারাই শুরু করছেন, যাঁরা জানতেন, যা তাঁদের জানার কথা ছিল না, জানছেন বইলা জানতে পারছেন আর এইভাবে ঘটনাটারে কনশাসলি উনারা আগাইয়া নিয়া আসছিলেন। একটা সেন্স অফ অরিজিনালিটি থিকা এইটা শুরু হইছিল। যে, আসলে ঘটনাটা কী! কোন অ্যাজা¤পশনটা অ্যাকচুয়ালি অপারেট করতেছে!

সব ইল্যুশনরে ঘুটা দিয়া পরিস্থিতিরে ব্যাখ্যা করার মতো স্যালাইন উনারা আবিষ্কার কইরা ফেলতে পারতেছিলেন। বাংলাদেশের ইউনির্ভাসিটি'র কোন একটা সেমিনারেরও কন্ট্রিবিউশন ছিল ওই আবিষ্কারে। আর সেইটা খুব দ্রুতই ছড়াইয়া পড়তেছিলো সুপার শপে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে, মুদির দোকানে, ফার্মেসীতে, চা-সিগ্রেটের দোকানে সবাই তখন অরিজিনালিটিরেই খুঁইজা পাইতে থাকলো। এখন ধর্মের চাইতে কোর অরিজিনাল আর কী আছে! সবাই নিজেদের অনুমানের অস্ত্র নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়লো। একজন আরেকজনের রিয়ালিটির দিকে। একদিন বিকালবেলায়। পৃথিবীতে ধর্মযুদ্ধ শুরু হইলো। এইভাবে। একটা আন-আইডেন্টিফাইড ভাইরাসের মতো, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নিউজের মতো ছড়াইয়া পড়লো দ্রুত।

শহরে তেমন কেউ নাই আমার। এক চাচার বাসায় গেলাম। মেইনলি পরামর্শ করতেই। যে, আমি বা আমরা এখন কি করবো! তিনি চুপচাপ স্বভাবের। একলাই থাকেন। উনার বাসার বসার ঘর পর্যন্তই আমরা গেছি। এর ভিতরে আর কেউ যাই নাই। সুতরাং আর কেউ থাকলেও আমরা দেখি নাই। এইভাবে জানি যে, উনি

একলাই থাকেন। গিয়া বুঝলাম যে, আর যা-ই হোক, উনার এইখানে থাকার কথা ভাবা যায় না। উনি আমারে শেল্টার দিবেন না। কিন্তু উনি নিজের সিকিউরিটি নিয়া বেশ কনফিডেন্ট।

অন্তঃত পারসোনালি কোন রিস্ক উনার নাই, এইরকম একটা ব্যাপার আছে। এই অঞ্চলে যারা প্রভাবশালী তাদের সাথে উনার এক ধরণের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে।

বেশি মানুষরে সিকিউরড করতে গেলে নিজের সিকিউরিটিই ঝামেলায় পড়ার কথা। এমনিতে উনারে ঝামেলায় ফেলতেও চাই না। তবে ভাবছিলাম যে, ভদ্রতার খাতিরেও মানুষ রিকোয়েস্ট করতে পারতো ত! যা-ই হোক, এইটা ব্যাপার না। নিজে বাঁচলে তারপর না ভাতিজা'র নাম। উনারে দোষ দেই না আমি। বেশি বিপদে পড়লে, মানে মারা যাওয়ার সিচুয়েশনে পড়লে কখনো আসবো নে।

বাইর হয়া আরেকটা বাসায় যাই। বাসাটার দরজা খুললেই বিশাল একটা ড্রইংরুম। তার জামাইয়ের সাথে গা ঘেঁষাঘেষি কইরা বইসা আছে আমারই সমান বয়সী একজন নারী। আমার ছোট বোন। ওর বাসাতেই থাকবো আমি। ওরা খুব হ্যাপি কাপল। ওদের বাসা দেখলেই বোঝা যায়। কয়েকটা জামা-কাপড় পইড়া আছে সোফার ওপর, ডাইনিং টেবিলে কয়েকটা বাটি, খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসনগুলাও ওঠানো হয় নাই আর তারপরও ওদের মুখে কোন অপরাধবোধের হাসি নাই, নিজেদের গোছানো গোছানো দেখানোর কোন তাড়াহুড়া নাই। প্রেমের বাস্তবতা ত এইরকমই, একটু অগোছালো ধরণের। আমার সাথে বইসা গল্প করতেছে, একজন

আরেকজনের কোলের উপ্রে প্রায় আর একইসাথে ভাবতেছে আমি এই রুম ছাইড়া গেলেই ওদের আনফিনিশড ফোরপ্লেটা আবার শুরু করতে পারবে। এইরকম স্মুথনেন্স ভালো লাগে। খালি মন-ই না, ভালোবাসার মতো শরীরও ওদের আছে।

২.

আমরা থাকতে শুরু করি ওদের বাসায়- আমি, আমার বউ আর মেয়ে। অবশ্য নিজেরে ছাড়া আর কাউরেই আমি দেখি না। ইন্ডিভিজ্যুয়াল ইন্ডিভিজ্যুয়ালই থাকি সবাই। একই ঘরে থাকি যদিও। কারো সাথেই কোন কথা নাই। বাইরেও খুব একটা যাই না। যাওয়া যায় না আসলে। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা, হঠাৎ হঠাৎ কয়েকটা মানুষ তাড়াতাড়ি হাঁইটা যায়। রিকশাও যায় দুই একটা। প্রাইভেট কার দেখাই যায় না, রাস্তায়। সারাদিন বাসায় বইসা কী যে করি! মাঝে-মধ্যে বাইরে যাই এই দমবন্ধ অবস্থা কাটাইতে। বাজারে দোকান নাই। আছে পজিশন হিসাবে, কিন্তু বন্ধ সব। শাটার নামানো। কিন্তু শাটারে আবার তালাও লাগানো নাই। দুই একটা শাটার পুরাটা লাগানো না। ভিতরে লাশ থাকতে পারে, মানুষের। কুত্তা বিলাই ইন্দুরের বাসা ওইগুলা; আমাদের মুদি দোকান আর ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরগুলা। এমনিতে রাস্তার কয়েকজন মানুষ বেতের ঝুড়িতে কিছু সব্জি নিয়া বইসা থাকে। বইসা থাকা দেইখা মনে হয় মরার অপেক্ষা করতেছে। বাসায় বইসা বইসা বাঁইচা থাকতে আর ভাল্লাগতেছে না ইন্ডিভিজ্যুয়ালটার। এই সব্জিগুলাতে ফরমালিন আছে কি নাই, এইরকম কোন সাইনবোর্ডও নাই। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না মনে হয়, ফরমালিন

আছে কি নাই। নিলে নেন ভাই, না নিলে নাই। আজাইরা কথার কি কাম! দুনিয়া এইরকম, যেন কোথাও কোনদিন কিছু না ঘটতে ঘটতে শেষ হয়া যাইতেছে।

এমনকি মনেহয় দুনিয়ায় কোন উইকলি মিটিংও হইতো না কোনদিন!

রাস্তায় রক্ত জইমা থাকতে থাকতে শুকাইয়া গেছে। মানুষ দেখলেই ভয় করে। মারতে আসতেছে না তো। ঘটনা মনে হয় এখনই ঘটতে যাইতেছে। তার মানে, ঘটনা ঘটতেছে আসলে। আমি দেখি না বইলা মনে হয় যেন ঘটে না। ভয়ে ভয়ে আমরা সবাই ঘটনার বাইরে চইলা যাইতেছি। আর ঘটনা ছুরি-তলোয়ার-পিস্তল-বন্দুক-কামান-ট্যাংক-মিসাইল-যুদ্ধবিমান ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়া আমাদের দিয়া ছুইটা আসতেছে। আমরা ভয়ে ভয়ে আবার বাসার ভিতরে পায়খানায় গিয়া বইসা থাকি। দুই হাঁটুর চিপায় নিজের মুখ গুঁইজা নিজের ধোন চুষি। নিজের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে দেখি অন্য আরেকটা দুনিয়া। গু-মুতই বেসিক্যালি। ওইখানেও। বর্তমানের দুনিয়া ছাইড়া আর কদ্দূরই বা যাইতে পারি আমরা।

যখন আমরা আর যাইতে পারি না, তখন ঘটনাগুলা চইলা আসতে থাকে আমাদের কাছে। এইরকমই একটা দিনে চাচার বাসায় যাই আবার। তখন দেখি আমার বড় বইনও আসছে তার জামাই নিয়া। জামাইটা কী রকম জানি! উদাসিও না ঠিক, থতমত রকমের; বিয়া যে কইরা ফেলছে মনে হয় বুঝতে পারে না। লাতিন আম্রিকার উপন্যাস নিয়া উত্তেজিত হইতে হইতে, স্বপ্নে মার্কেজের কথা ভাবতে ভাবতে, মাল আউট হইয়া যাওয়ার মতো, যুদ্ধের দিনগুলিতে বিয়া - এইরকম

একটা উল্টাপাল্টা উপন্যাস লিইখা ফেলছে। এখন ছাপাইবো কিনা, বুঝতে পারতেছে না। এইজন্য সিনিয়র ঔপন্যাসিকের কাছে পরামর্শ নিতে আসছে। এইরকম।

ওরা দুইজনে তিনজনের একটা সোফায় বইসা আছে। চাচা সামনে, অন্যদিকে তাকাইয়া আছেন। উনি সবসময় সিঙ্গেল সোফাতে বসেন। কেন করতে গেলা তোমরা এই বিয়া - এইরকম একটা ভাব উনার। বিয়া ছাড়াও ত চলতো। একসাথে থাকতা, ওইটাও ত এনাফ। এখনকার সময়ে কেউ আবার বিয়া করে নাকি, লিভ টুগেদার ছাইড়া; এতে কইরা লিগ্যাল কমপ্লিকেসিগুলা বাড়ে তো! যদিও তিনি বলেন না, এইগুলা। কেমন একটা ডিন্যায়ালের ভঙ্গিতে বইসা থাকেন। আমার মনে হয়, খারাপ করে নাই ওরা। এইরকম যুদ্ধের সময় বীরঙ্গনা হওয়ার চেষ্টা করার চাইতে বিয়া করা ভালো। কিন্তু বিয়া কইরা ওরা বাঁচতে পারবে তো! ওরা ত বিয়া করছে বাঁচতে চায় বইলা। এই পারসপেক্টিভ থিকা এইটা প্রায় মিনিংলেস একটা ব্যাপার। আমি সেইটা ভাবি। তাছাড়া, বিয়া জিনিসটা তো আর প্রেম না। আর আমাদের প্রেম কোনদিনই আমাদের বাঁচাইতে রাখতে পারে না, মরাটা যে দরকার এইরকম একটা ফিলিংসের কাছেই নিয়া যাইতে পারে। মারতে পারে না। লোভ, জেলাসি, হেইট, হঠকারিতা, পাপ-পূণ্য এইসবকিছু যতোটা বাঁচাইয়া রাখতে পারে আমরা'রে, প্রেম সেইটা পারে না। আরো, স্পেশালি ধর্মযুদ্ধের সময়টাতে। অথচ ওরা কি জড়োসড়ো, বিয়া করছে প্রেমে পড়তে চাইতেছে বইলা, একজন আরেকজনের। আর একটা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরেই!

‘চাচা, আমরা এখন যাই। আপনি দোয়া কইরেন!’ আমার বড় বইন এই কথা বইলা তার জামাইরে ওঠতে ইশারা করে। নিজেও ওইঠা দাঁড়ায়। আমারে কিছু কয় না, চাচার সামনে। আমিও বলি না কিছু। কি বলবো ওরে, ও-ই ত আমার সাথে কথা কইতে চায় না। ও বড় বইন না, কথা ত ও কইবো; আমি ছোট হইয়াও ওর সামনে আবার ছোট কেমনে হমু! বড় বইন’টা এতো বোকা যে আমার খারাপ লাগে। মনে হয় যে ওরে কই, তুই ক্যান এইসব করতেচছ; তুই কি ভাবিস যে, নিজের সাথে প্রতারণা করতে পারলেই বাঁইচা থাকা পসিবল! ও তো, আমার কথা শুনে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন কনর্ভাসেশনই হয় না। হওয়াটা যে সম্ভব না, এইটা আমরা বুঝতে পারি।

কমিউনিজমের পতন হইছে সেই নাইনটিইজে, বার্লিন ওয়ালও ভাঙ্গছে; কিন্তু নদ্দা আর বারিধারার যেই কূটনৈতিক দেয়াল সেইটা জানি কোনসময়ই ভাঙবে না! আরো নতুন নতুন দেয়াল উঠবো বরং। ক্লাস স্ট্রাগলরে আমরা একটা রেসিয়াল কনফ্লিক্টের জায়গাতে নিয়া যাবে সবাই। এইরকম একটা নিশ্চয়তা আসে আমার মনে। শে বাইর হইয়া যায়। নরমাল একটা শাড়ি, অথচ কী সুন্দর কইরা পড়ছে, আমার বইনটা!

আনিসুল হকের কথার মতো আমি লিখি আর কান্দি। আমিও ফিরা আসি আমার ছোটবোনের বাড়িতে।

দেখি, ওর শ্বশুর শাশুড়ি আসছে। ছোট শহর থিকা। ওইখানে আরো বেশি ঝামেলা। সবাই সবাইরে চিনে। যুদ্ধের নাম দিয়া যে যারে খুশি মারতেছে। পারসোনাল প্রতিশোধ নিতেছে। কাউরে বিশ্বাস করা যায় না। হাইস্কুলের ফ্রেন্ড, যারে ফুটবল খেলতে গিয়া ফাউল করছিলাম, সে-ই এখন সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে চায়। বাড়ির চাকর, যারে ছোট থাকতে থাপ্পড় মারছিলাম, সে আরব গেরিলাদের সমর্থন করে এখন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় না পইড়াই। কিন্তু পইড়া ফেলতে পারে এইরকম প্রিপারেশন নিতেছে। বইটা খুঁজতেছে অ্যাক্টিভলি। যদি পইড়াই ফেলে, তাইলে ত শেষ! এইরকম বিপদজনক পরিস্থিতি।

এইজন্য উনারা ফেরি পার হইয়া এই শহরে চইলা আসছে, ছেলের কাছে। উনারা যেহেতু ভয়ের দুনিয়া থিকা আসছে আমাদেরকে আরো বড় বড় ভয় দেখাইতে চায়। কয়, এইটা করো, ওইটা করো। বাথরুমে গেলে অন্তঃত এক ঘন্টা বইসা থাকতে হইবো; তারপর সোফাতে বইলে একটা পা ভাঁজ কইরা বসতে হইবো, পূবদিকে বইলে বাম পা; আর পশ্চিমে ডান পা। কারণ পূর্ব-পশ্চিম ত ডিফরেন্ট। কেউ রিজন নিয়া আসলে তারে ভাবের কথা দিয়া ঠেকাইতে হইবো; আর কেউ মেটাজিক্যাল আলাপ শুরু করলে, কড়া যুক্তির আলাপ শুরু করা লাগবো। তা না হইলে সেইফ থাকা যাইবো না। তুমি যা না, সেইটা প্রুফ করা লাগবো। বুইঝা ফেলেলেই শেষ! এইরকম বুদ্ধিমান রকমের মানুষ উনারা। যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা এখনো কনসালটেন্সির লাইগা কেন যে উনাদের ভাড়া করে না! ছোটবোন আর বইনের জামাই পাত্তা দেয় না অবশ্য। বুড়া মানুষ, তারপর আবার বাপ-মা। উনাদের কথা শোনা লাগে। এইটা একটা নিয়ম। আইন না। কারণ আইনের রেমিডি আছে, অমান্য

করলে ফাইন দিবেন। কিন্তু আইনের বাইরে যেই নিয়ম, নৈতিকতা; সেইগুলাই অনেকবেশি সেনসেটিভ।

একদিন খাইতে বইসা ওর শ্বশুর কয়, সবাইরে শান্তিতে থাকতে হইলে, ফ্যামিলির কাউরে না কাউরে কোরবানি দিতে হয়; এইটারে বলে সদকা। একটু একটু কয়, আর আমার দিকে তাকায়। বুইড়া বেটার বাঁচার কেন এতো শখ! সে বাঁইচা থাইকা কী করবে! এইটা উনার আসল উদ্দেশ্য না। যেহেতু উনি নিজরে গোপন করতে চান উপমা-উৎপ্রেক্ষার ভিতর দিয়া নিজের মনের রাগ-ক্ষোভ-দুঃখ-হতাশারে পগার-পার কইরা দেন; সেইরকম কবিতার ব্যাখ্যার মতো, যা কিছু বলতে গিয়া বলেন নাই, সেইটারে খুঁইজা বাইর করতে হবে।

আমি বুঝতে পারি, সে আসলে বাঁচতে চায় না, অন্যদের বাঁইচা থাকার গ্লানিটারে সে দেখতে চায়। এর চে ত মরণ-ই ভালো, শ্যামো সমান গান শুনতে চায়। সে স্পষ্ট কইরা কিছু কয় না; কয় যে, কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধটা আমাদের গলিতে চইলা আসবে। তখন যাঁরা যুদ্ধ করতে চায়, তাদেরকে ঘরে আটকাইয়া রাখতে হইলে, যুদ্ধ-বিয়ার ব্যবস্থা করতে হইবো। আমি বুঝি যে, ওই শুয়োরের বাচ্চা আমার বউ'রে বিয়া দিতে চায় যাতে কইরা আমার বাঁইচা থাকাটা ওরই সমান গ্লানিময় হইতে পারে। আমার যে হতাশা কম, এইটা তারে বেশি হতাশাগ্রস্থ করে। সে এই ট্রাপ থিকা বাইর হইতে চায়। সাম্যবাদ চায়; ডেফিনেটলি একটা রংওয়েতে। মানুষ ভুল পথে যাইতে থাকলে এতো দ্রুত যাইতে থাকে যে তারে

আটকানোটা মুশকিল। যেমন এখন কেউ গল্প পড়তে পড়তে অর্ধেক শব্দই এভয়েড কইরা যাবে, এইটা আমি বুঝতে পারি। তারপরও আবার গল্পে ব্যাক করি।

আমি দাঁতে দাঁত চাইপা ভাত খাই। যেন সে কী বলছে আমি বুঝি নাই। শুনিই নাই। অফিসের মিটিং মিনিটস নেয়ার মতো। আমি জানি তার দ্বিতীয়বার বলার সাহস নাই। যদি বইলাই ফেলে, শালারে আমি খাইছি! ডিপজলের মতো চোখ চোখ বড় বড় কইরা ফেলি মনে মনে! ওই অশ্লীল ডিপজল না, ফ্যামিলি ড্রামা, চাচ্চু সিনেমার পোস্টারের মতো!

আমার আর আমার বউয়ের একটা পিস্তল আছে। ওয়ারড্রোবের ড্রয়ারে রাখছি সেইটা। শুয়োরের বাচ্চা যদি আরেকটা কথা কয়, পিস্তল নিয়া আইসা ওরেই গুলি করবো আমি। আমার ছোটবোন, তার জামাই আর তার মা সবাই চুপচাপ খাইতে থাকে। আমার মনে হয়, আমার বউ পিস্তলটা নিয়া আইসা ওরে গুলি করুক। তারপর ওর রক্ত দিয়া ভাত মাইখা খাই আমরা। দুধের মধ্যে আম দিয়া মাইখা খাওয়ার মতো। অথবা গরুর মাংসের ঝোলের মতো। বারবার গরম করতে করতে ঘন হইয়া যাওয়া ঝোলের মতো। আমি আরো দ্রুত ভাত খাইতে থাকি। ভাত-খাওয়ার ভিতর দিয়া তার ইশারা-ইঙ্গিতময় বাক্যরে আমি ইগনোর করতে করতে শেষ কইরা দিতে থাকি। ঈদসংখ্যার গল্প ফেইসবুকের নোটে দেয়ার মতো; তাও ট্যাগ দেয়া নাই কাউরে, কোন লাইক নাই, শেয়ার নাই; অটোম্যাটিক্যালি অনলি মি হইয়া যাওয়া অপশনের মতো অস্তিত্বহীন কইরা দিতে থাকি তার অস্তিত্বরে।

কোনকিছুই ঘটে না আর। ক্লান্ত লাগে। আমরা যার যার মতো শুইয়া পড়ি। ঘুম আসে না।

৩.

সুড়ঙ্গের কথা মনে হয় তখন। বাসার নিচ দিয়া যেইটা আছে। আরো আরো বাসার সাথে কান্টেটেড। প্রতিটা বাসার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অনেক দূরে। তিন মাস হাঁইটা গেলে পরে নাকি দুইটা ডেস্টিনেশন আছে। একটা গিয়া মরভূমিতে ওঠছে। আরেকটা সমুদ্রের পারে। অনেকদিন ধইরা, অনেক মানুষ মিইলা এই সুড়ঙ্গটা বানাইছিল। যাঁরা মূলত এক্সেপিস্ট। কিন্তু ছাইড়াও যাইতে চায় নাই এই সাধের দুনিয়া। তারা ইন্ডিভিজ্যুয়ালি যার যার সুড়ঙ্গ বানাইয়া ঢাকনা দিয়া রাখছে। চাইলে যে কেউই এই পথ দিয়া চইলা যাইতে পারে। একটা সুড়ঙ্গের শেষে আরেকটা সুড়ঙ্গের কোড দেয়া আছে। এইভাবে কইরা যাইতে হয়। কিন্তু কেউ-ই যায় না। কেন যে যায় না, এইটাও কেউ জানে না। কিন্তু জানে যে, যাওয়া যায়। ইচ্ছা করলেই। ইচ্ছা কি করে না কারোরই!

এখন ইউজ করা যাইতে পারে ত। ভাবি আমি। পালাইয়াই যাই। নিজের ছোট বইনের শ্বশুররে গুলি করার চাইতে ভালো আমরাই চইলা যাই। আমি আর আমার বউ। তাইলে মেয়েটার কি হবে! ওরে রাইখা ত যাইতে পারবো না আমরা। নিয়াও যাইতে পারবো না। তাইলে কেন আর এইটার কথা ভাবি আমি! সম্ভবত এই কারণেই ভাবি যে, এইটা শান্তি দেয়, একটা লাস্ট অপশন ত আছে! কিন্তু সেই

অপশনটা কেউ আর ইউজ করি না। করা যাবে, কিন্তু করি না আর কী, এইরকম সম্ভাবনাময় তরুণ কবির মতো দিন পার করি। সবাই।

যদ্দূর মনে হয়, সুড়ঙ্গের এই আইডিয়াটা ইনভেন্ট করার সাথে আমার পরিচিতদের মধ্যে জড়িত ছিলেন ইউসুফ ভাই। আমরা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, সেভেনে উঠব। ইউসুফ ভাই ক্লাস সেভেনে পড়েন, এইটে উঠবেন। একদিন খবর আসলো যে, উনি ত হাওয়া! বাসা থিকা পালাইয়া গেছেন। ত, এইরকম আমরাও পালাইছি, রেলষ্টেশনে গিয়া রাত বারোটা পর্যন্ত বইসা রইছি। পরে ষ্টেশন মাস্টার দেইখা কয়, বাসা থিকা রাগ কইরা চইলা আসছো, বাসায় যাও, নাইলে পুলিশে ধইরা লইয়া যাইবো। ফেরিঘাটে যাইতে গিয়া, অর্ধেক পথে পরিচিত মানুষজন দেইখা আবার বাসার সিঁড়িতে আইসা বইসা থাকতে থাকতে ঘুমাইয়া পড়ছি। পরে মারুফ ভাই আইসা ঠেলা দিছে, এইখানে বইসা কি কর? আমি গেইট খুইলা দিবো? ভিতরে আসো! পরে লজ্জার মাথা খাইয়া বাসায় ঢুকছি আবার।

কিন্তু ইউসুফ ভাইয়ের ঘটনাটা এইরকম না। আজকে নিয়া পাঁচদিন হইছে। কোন খোঁজ-খবরই নাই। তারো আট-দশদিন পরে, এয়ারপোর্ট এলাকা থিকা পাওয়া গেছে তারে। উনি প্যালেস্টাইনে যাইতে নিছিলেন, ইনতিফাদায় যোগ দিবেন বইলা। বয়স কম, এইজন্য উনারে নেয় নাই। কিন্তু উনি যোগাযোগ কইরা আসছিলেন। কিছুদিন পরেই আবার চইলা যাবেন। আমরা তখন উনারে পাগল ঘোষণা দিয়া ছাড়িই নাই সবাই, পরিত্যাগই করছি একযোগে; কারণ আমরা তখন পাঠাগারে যাই, কবিতা আবৃত্তি করি, ব্যাডমিন্টন খেলি, আমরা কেন প্যালেস্টাইন

যামু, কুত্তায় কামড়াইছে নাকি! তাও স্কুলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা বাদ দিয়া! তখন ফেসবুক থাকলে নাহয় লিখতাম, আই অ্যাম চুদুরবুদুর ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ নোহ্যয়ার অ্যান্ড আই সার্পোট গাজা! কারণ কদ্দিন পরেই যেহেতু এইটা থাকবো না, তখন নাতি-নাতনিদের কইতে পারবো যে, সুনীল গঙ্গো'র কবিতার মতো একবার অ্যাক্ট করতে পারছিলাম রে লাইফে; প্যানকেইকের মতো পুরুষ বুক ফুলাইয়া কইছিলাম যে, দেখিস একদিন আমরাও! আর এইরকম কথার ভিতর দিয়াই লাইফরে ফুললি কনজিউমড কইরা ফেলতে পারছিলাম আমরা।

ইউসুফ ভাই এইরকম ফাও কথার পাবলিক না। উনি যে ফাও কথা বলেনও নাই এর নজির পাওয়া গেলো তারো এগারো-বারো বছর পরে। ইউপিএল'র মহিউদ্দিন সাহেব কেন্দ্রীয় গ্রন্থকেন্দ্রে পাবলিকেশন্সের ক্লাশ নিতে আইসা বলেন; গতকাল রাতে বিবিসি'র নিউজ দেখছেন? আপনি খালি ত এমটিভি আর চ্যানেল ভি দেখেন; ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ইকনিকমসে পড়েন কিন্তু মিডিল-ইস্ট সর্ম্পকে আগ্রহ দেখান না, এইটা কেমনে হয়; অর্ধ-নগ্ন নাচ-গান দেখেন সমস্যা নাই, কিন্তু ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের খবরটা অন্তঃত নিয়েন। আমি ভোর চারটার সময় উঠি খালি প্রাইম নিউজটা দেখার লাইগা। তাহাজ্জুদের নামাজ পইড়াও লাভ হবে না মুসলমানদের। খবর-টবর রাখতে হবে। রেজর শার্প হইতে হবে, জিলেটের ফাইভ ব্লেডের মতো। তখন কিছুটা টের পাইছিলাম যে, ইউসুফ ভাই আসলেই একটা যোগাযোগ রাইখা গেছিলো। তারপরও আমি কখনোই ইন্টারেস্টেড হইতে পারি নাই খুব একটা।

ইউসুফ ভাই সত্যিকারের পাগল হওয়ার আগে আমারে খবরটা দিয়া গেছিলো। কইলো যে; মিয়া, তোমারে না কইলে ত তুমি জিন্দেগীতেও জানতে পারবা না! কোন দুনিয়ায় যে থাকো!

তখন ডিটেইলসটা কইলেন আমারে সুড়ঙ্গ বিষয়ে। আমি ত তখন বিস্ময়ে পাদ দিয়া দেই; কই, এইটা কেমনে সম্ভব! ইউসুফ ভাই কয়, সবাই এইটা জানে; তুমিই খালি আবাল; কোন দুনিয়ায় যে থাকো! একই কথা কয়েকবার কইরা কন উনি; যেন এক একবার কইলে এক একটা আলাদা মানে ক্রিয়েট হয়। কবিতার লাইনের মতোন। সুড়ঙ্গগুলার সূত্র উনারে আউলাইয়া দিছিলো আসলে। কারণ সুড়ঙ্গের একটা ডেস্টিনেশন হওয়ার কথা ছিল প্যালেস্টাইনের কাছাকাছিতে, সিরিয়া বা জর্ডানে গিয়া। ওইটা আর পারা যায় নাই; আটকাইয়া গেছে কেমনে জানি। কোন একটা কোডে ভুল করতে পারলেই খালি যাওয়া সম্ভব। উনি চেষ্টা করতেছেন অনেকদিন ধইরা, কিন্তু বারবার আটকাইয়া যাইতেছেন। সবসময় ঠিক কাজটাই কইরা ফেলেন। সঠিক সময়ে সঠিক ভুলটা উনি করতে পারেন না। ব্রদিয়াঁর বইটই পড়লে হয়তো কিছু কাজে দিতো। উনি আসছিলেন মূলতঃ এইসব নিয়া আমার সাথে আলাপ করার লাইগা। কিন্তু উনার প্যাঁচ-গোচ দেইখা আমিও কনফিউজড হইয়া যাই। আমাদের অস্তিত্বও যখন আটকাইয়া যায়, যুদ্ধটা যখন হাঁসফাঁস লাগে তখন সুড়ঙ্গগুলার চিন্তা আইসা আমাদের বাঁচাইয়া দেয়। নিজেদের বাসার নিচে সুড়ঙ্গ নিয়া আমরা বাঁইচা থাকতে থাকি।

আর পিস্তল ত আছেই। শুয়োরের বাচ্চা, তোর বাপ যদি আরেকদিন এইগুলা নিয়া কোন কথা কয়, তাইলে ওরে আমি গুলিই কইরা দিবো। ছোটবোনের জামাইরে মনে মনে কইলাম আমি।

৪.

মানুষ না ইহুদি ওরা জিজ্ঞাসে কোনজন?

মুসলমান না বলছিলেন?

হিঁদু নয় ত রে?

হইতে পারে। বুডিস্ট আর হিন্দুরা ত একইরকম।

নিজেদের মিস্টিক মাইনরিটি ঘোষণা কইরা কন্টিনেন্টাল কোটার সুবিধা নিতেছে।

সুবিধা কে না নেয়!

এর লাইগা মানুষ মারবো?

মানুষ আবার মারা যায় নাকি। অ-মানুষ মারতে হয়।

যার মনের হুঁশ নাই, সে কেমনে মানুষ হয়।

শব্দের অরিজিনালিটি দেখেন; তারপরে কন এইসব কথা।

তাই তো, যে যুদ্ধ করে, সে বালের কিসের মানুষ!

শিশু আর নারী!

নারী আর শিশু!

উহারা উহ্য! সমবেদনা স্বরূপ।

মানুষ মারা যায়, কিন্তু নারী ও শিশু, দেখো!

ওরা ত আধা-মানুষ!

যুদ্ধ কি খারাপ দেখো; আধা-মানুষরেও মানুষ বানাইয়া ফেলে।
তারপরও আমরা যুদ্ধ করতে থাকি।
অফিস থিকা রাস্তায় চইলা আসি।
বড় রাস্তা থিকা ছোট রাস্তায়।
ছোট রাস্তা থিকা বাসায়।
বাসা থিকা বিছানায়।
সরতে সরতে জায়গা আর নাই।
যুদ্ধ আইসা আমরার গায়ের উপ্রে পড়ে।
আমরা যুদ্ধ করি না ত!
হ্যাঁ, হ্যাঁ... এইটাই ত!
একটা উদাহারণ দেই:
ডাইনপাশ পুরা ফাঁকা দেখেন! ওইপাশে আরেকটা ঈদসংখ্যার উপন্যাস ছাপানো যাইবো প্যারালালি। দেখেন, দেখেন! আরে ভাই, কই যান! গল্প ছাপাইবেন না!

আত্মস্মৃতি এবং জার্নালমূলক জবরদস্তি, অ্যাকাডেমিক্যালিও রিলিভেন্ট। সাহিত্য ত এখন এইগুলাই। ক্ল্যাসিক আর কেডা পড়ে! উদাহারণ হিসাবে দুই একটা লিইখা রাখা যায় হয়তো।

গল্পলেখকরা সবাই ত স্ট্যাটাসরাইটার, ষ্টোরিওটাইপ
ওদের ক্যাপাবিলিটি আসলে নষ্ট হইয়া গেছে।
লিখতেই পারে না।

যেহেতু আমি-ই লিখতে পারি না। অরা কেমনে লেখে!

লিখলেও লেখা হয় নাকি!

ওদের বাচ্চাকাল দেখা আছে আমার।

কিন্তু অরাও ত যুদ্ধ করবো, করবো না?

প্রতিবাদ করতে করতে শব্দরে গোলা বানাইয়া ফেলবো।

তারপর মনে হইবো, হইছে ত প্রতিবাদী-সাহিত্য!

বরফের গোলার মতো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই আইসবলের মতো না? তুষার ঝড়ের সময়

হলিউডের সিনেমাতে দেখছি ত আমরা।

হিস্ট্রিক্যালি কি এই আইডিয়াটা ওই জায়গা থিকাই আসছে?

হিস্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টের চাইতে ন্যারেটিভের ফ্যাক্টগুলা গুরুত্বপূর্ণ অনেক। মনে রাইখেন।

মনে আর কতোকিছু রাখবো রে, ভাই! মার্ক্সই ভালো ছিলো, আবার ফুকো-দেরিদারেও আনলেন!

লিস্টে ত আরো আছে, পুরাণের ভিতর থিকা জাইগা ওঠতেছেন হেগেল!

দেখেন ভাই, গল্প-লেখকের মনে এইসবকিছুর কোন ইমপ্যাক্ট নাই।

মন-ই ত নাই!

আমরা এখন যুদ্ধের ভিতর আছি ত এই কারণেই।

কিন্তু শান্তিও ত আসবে।

শেফালি'র পুটকিজাত সন্তান নাকি সে!

হেরোইনখোরের কবিতা বলেন? মিশুর?

না, না; উনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান...
অরিজিনালটারে ইগনোর করেন
আপনার ভাই মুখ খারাপ
যুদ্ধের সময় না এখন; জায়েজ এইটা!
জায়েজ না, সিদ্ধ বলেন!

ডাইনপাশ পুরা ফাঁকা দেখেন! ওইপাশে আরেকটা ঈদসংখ্যার উপন্যাস ছাপানো যাইবো প্যারালালি। দেখেন, দেখেন! আরে ভাই, কই যান! গল্প ছাপাইবেন না!

আত্মস্মৃতি এবং জার্নালমূলক জবরদস্তি, অ্যাকাডেমিক্যালিও রিলিভেন্ট। সাহিত্য ত এখন এইগুলাই।

কে যে কথা বলে। কে যে প্রশ্ন করে। আর কে উত্তর দেয়। কেউ জানে না। নিজে নিজেই মানুষ এইগুলা বানায়। বানাইয়া বানাইয়া কথা বলে। মানুষজন খুব বোরড থাকে আসলে যুদ্ধের সময়। রেডিও টিভি নাই, ক¤িপউটার নাই, ইন্টারনেট নাই, সোশ্যাল মিডিয়া নাই যে রিভিল করবে, আমাদের শংকা ও আশংকার রিলিভেন্সগুলা। আমাদের ভরপুর কইরা রাখবে নিউজের পর নিউজ দিয়া; লোনলিনেসরে বাড়াইয়া তুলবে, আটকাইয়া দিবে। মনে হবে, কমিউনিকেশনই জীবন! আই কমিউনিকেট, দেয়ারফোর আই এগজিস্ট! আরে ভাই, মোবাইল ফোন-ই ত নাই! কমিউনিকেশন কেমনে হবে! দেখেন না, গল্পে কোন ডায়ালগ নাই, যা আছে তাও কাল্পনিক! মোবাইল ফোন ছাড়া কোন কথা বলা যায় নাকি। না

যায় গরিব-দুঃখীদের লাইগা ঈদের জামা কিনা! উনাদের প্রতি আমাদের অফুরন্ত ভালোবাসাও ত আমরা এখন এক্সপ্রেস করতে পারি না, উনাদের কনজামশন করতে না দিতে পাইরা। এইটাই আসলে যুদ্ধের সবচে' ওরস্ট পার্ট। আরো হয়তো আছে। কিন্তু এইটাই সবচে' বেশি ভিজিবল, ইন আওয়ার লিটারেচার। আপনারাই দেখেন! হে পাঠক, বোবা-বন্ধু আমার!

৫.

কমিউনিকেশন ত করা লাগবে। মোবাইল যেহেতু নাই। আবার একদিন হাঁটতে হাঁটতেই আমি চাচার বাসায় যাই। উনারও চেহারার কোন চেইঞ্জ নাই। একইরকম আছে। বড় বইন আবার বিয়া কইরা চাচার বাসায় দেখা করতে আসছে। এইবারের জামাইটা ধুরন্ধর। কথা-বার্তা কম কয়। এইদিক-ওইদিক তাকায় বারবার। সবজানি সববুঝি এইরকম একটা ভাব। আগের জামাইটা মারা গেছে। বা মাইরা ফেলছে আসলে। কয়েকদিন পরে জামাইয়ের এই বড়ভাইটা তারে আবার বিয়া করছে। যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের নাম দিয়া কতকিছু যে হয়!

আমার বড় বইনটা খুবই সাদাসিধা, বেক্কল টাইপ। এই কারণে হিংসুক; ভাবে যে, ভাই-বইনের সাথে দূরত্বই ওরে বাঁচাইয়া রাখবো। অথবা ছোটবেলা আমরা যে ওরে খুব একটা পাত্তা দিতাম না, এইটা ভাইবা শে এখনো কষ্ট পায়। আমারারে দেখলেই এভেয়ড করে। মাঝে মাঝে খালি মনে করায় যে আমরা এইরকম পাত্তা না দেয়ার পরেও শে বাঁইচা আছে। এতে কইরা আমরা যাতে নিজেদেরকে আরো অপরাধী ভাবতে পারি। শে মনে করে যে এইটা আমরারে আরো ছোট কইরা ফেলে। আমরা

মানে, আমি আর আমার ছোটবোন। কিন্তু আমরারও যে ভাল্লাগে সেইটা ত না। ওরে ত আমরা ফিল করি। শে নাই, কিন্তু তারে ছাড়া আমরা ত কমপ্লিট হইতে পারি না। এইরকম ইনকমপ্লিটনেসের ফিলিংসটা যখন তৈরি হয়, তখন আর কিছুই করা যায় না। আমরা একলা হইয়া যাইতে থাকি। আমরা আলাদা আলাদাভাবে ওর লাইগা কান্দি। আমাদের ধারণা, আমরা কান্তে কান্তে ওর সাথে মিলতে পারি। আমাদের কান্না ওরেও কি দুর্বল কইরা ফেলে না? ও যে আমরারই বড় বইন এইটা কি শে বুঝতে পারার কথা না?

ও বড় বইন; কিন্তু ও ত আসলে ছোট। কারণ ও ছিল একলা, অনেকদিন। ওই একলা সময়টা ওরে দখল কইরা ফেলছে। ও আর বাইর হইতে পারে না। আমরার কাছে আসতে পারে না। তারপরে, আবার এই যুদ্ধ।

ও ওর জামাইরে নিয়া বইসা থাকে। বড় চাচা অন্যদিকে তাকাইয়া থাকে।

বড় চাচারেও কেন জানি শুয়োরের বাচ্চা মনে হয় হঠাৎ। বয়স বাড়তে থাকলে মানুষ আরো নিজের খাঁচার ভিতর ঢুকতে থাকে। সে আমার বড় বইনের সাথে যা করছে, এইটার লাইগা সে মাফও চাইতে পারে না। অন্যদিকে তাকাইয়া থাকে। আব্বা মারা যাওয়ার পরে বড় বইনরে সে পালক নিছিলো, নিজেই মানুষ করছে, বিয়া দিছে। আর সে আলাদা কইরা ফেলছে তারে আমরার কাছ থিকা। আমরা যে একটা ফ্যামিলি এইটারে সে ভাইঙা ফেলছে। শুয়োরের বাচ্চা একটা! এখন অন্যদিকে তাকাইয়া থাকে।

বড় বইন যখনই চাচার বাসায় আসে, আমি তখনই কেমনে জানি চইলা আসি। ছোটবোন কোনসময়ই আসে না। আমি বাইর হইলে শে বুঝতে পারে। শে বাথরুমে চইলা যায়। ঢুকার সাথে সাথেই ট্যাপ থিকা পানি পড়ার আওয়াজ আসতে থাকে। বাথরুমের ফ্লোরে গিয়া পানি পড়ার শব্দ হয়। আমার ছোটবোন প্যানের ওপর বইসা থাকে। দুইহাতে চোখ-নাক-ঠোঁট-গাল চাইপা ধইরা বইসা থাকে। চিৎকার কইরা শে কান্দে। আমার ইচ্ছা হয়, তার পায়ের কাছে গিয়া বইসা থাকি। শে আমার গলা জড়াইয়া কান্দুক।

অথবা ট্যাপের পানিতে হাত দিয়া রাখি। তার শুনতে না-পাওয়া কান্নাটা শুনি আমি। কারণ আমি কানতে পারি না। আনিসুল হকের রোমান্টিকতা আমার আর আসে না, সেকেন্ড টাইমে। একদিন পিস্তলটা নিয়া আসবো আমি। বড়চাচার একটা চোখে গুলি কইরা দিবো। আরেকটা চোখে সে আমার দিকে তাকাইয়া থাকবো। লিটারালি, টারানটিনো'র সিনেমার মতো; আসবো আর গুলি কইরা দিবো। আজাইরা কোন সাসপেন্স নাই। রক্ত হইলো লাল, টমেটো সস না আর!

আমি ত ফ্যামিলির লাইগাই যুদ্ধে যাই নাই। তো এখন বুঝতে পারি, ফ্যামিলি ত আগে থিকাই নাই। আমি যুদ্ধেই চইলা যাবো। একটা একটা কইরা সবগুলা গুলি শেষ কইরা ফেলবো। সবগুলা গুলি শেষ হইয়া গেলে পরে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাবে। আরো অনেকগুলি গুলি যোগাড় না করা পর্যন্ত থাইমা থাকবে যুদ্ধ আমার। আবার শুরু হবে। আমি অফিস থিকা রাস্তায় আইসা দাঁড়াইয়া থাকবো। ফেরি পার হইতে

গিয়া হইবো না। ইকবাল ভাই আর মনির মামা কথা কইতে কইতে চইলা যাবে। আমি অফিসে যাইতে গিয়া বড়চাচার বাসায় চইলা যাবো। ছোটবোন আর ওর জামাইয়ের প্রেম দেখবো। দেইখা থাইকা যাবো ওদের বাসায়। চক্রে ও চক্রান্তে আমি বন্দী হইয়া যাবো, এই ওয়ার অ্যান্ড পিস সিচুয়েশনের।

৬.

একদিন টিভি'টা চালু হয় হঠাৎ। টিভি ষ্টেশনে মনে হয় কাজকাম চলতেইছিল। ব্রডকাস্ট হয় নাই খালি। সাতটার খবর সাতটার সময়ই হইছে, নয়টার খবর নয়টায়। এক সেকেন্ডও নড়চড় হয় নাই। এইজন্য ওদের কোন জড়তা নাই বা আনন্দও নাই কোন। যে, এইটা স্পেশাল একটা কিছু। এই কামই ত করতেছিলাম আমরা।

তখন বিকাল পাঁচটার খবরের সময়। নতুন সংবাদপাঠিকা। পাঁচটার খবরে ভালো করলে সাতটার খবরে প্রমোশন দিবে। এইরকম। ক্যামেরা যে চালু হইয়া গেছে সংবাদ-পাঠিকা টের পায় নাই। নতুনদের এইরকম হয়। ইশারাগুলা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে না। দাদী-নানীদের কথা মনে হয়, ঠাহর শব্দটাতে আইসা ট্রান্সমিশনটা আটকাইয়া আটকাইয়া আসে। নতুন শাড়ি পড়া শিখছে মনে হয়। এইজন্য বুঝতে পারে না, ঠিকঠাক মতো হইলো কিনা। শাড়ি-পড়াটা ঠিক পছন্দের জিনিসও না। কিন্তু পড়তে হয়। পুরান ট্রাডিশন একটু রাখতে হয়। যেমন, জয় বাংলা শ্লোগান যেমন পছন্দ করেন না হয়তো। জিন্দাবাদও নেয়াটা ঠিক হইবো কিনা শিওর না। মানে, পুরানা বাতিল হয়া গেছে আর নতুন আসতে পারতেছে না। এখন কি আর লোকালের টাইম আছে নাকি রে ভাই! কিন্তু, তবুও লোকালরে ধরিয়া রাখিতে হয়,

শাড়ির ভাঁজটা, কুঁচিগুলা, যা দেখাও যায় না, এইরকম ছোট ছোট জিনিসগুলি; স্পেশালি আপনি যখন পাঁচটার খবর থিকা সাতটার খবরে প্রমোশন চান, এইরকম একটা ক্রুসিয়াল মোমেন্টে ছোট ছোট জিনিসগুলি পারফেক্ট করতে পারতে হয়।

ছোট স্ক্রিপ্ট দেইখা শে একটু অবাক হয়; কয়, যুদ্ধ শেষ; এইবার আপনেরা হাসতে পারেন। উনিও হাসেন মৃদু; উনার রুচি যতোটা পারমিশন দেয় আর কী। আর সাথে সাথেই তার ছায়ানটের তরুণ (কিন্তু ম্যাচিউরড হইতে চাওয়া) প্রেমিকের স্মৃতি এবং অপ্রিমত প্রেমিকের কথা মনে হয়। সিগারেটের প্যাকেটে কর্করোগের কোশনের মতো কয়, হিন্দি সিরিয়াল দেখবেন না কিন্তু আবার; খবরদার! বাচ্চাদেরও ডোরেমন দেখতে দিয়েন না! তারপর জীবনানন্দীয় বিষাদের ভিতর উনি হারাইয়া যাইতে থাকেন ধীরে ধীরে, হাজার বছর ধইরা। উনার নাম খবরের শুরুতে কইছিলেন উনি বা স্ক্রীনে দেখাইছিল; এই পৃথিবী একবারই চান্স পাইছিল তারে দেখার; পায় নাকো আর!

যুদ্ধ যেমন, শান্তি ত এইরকমই। বোরিং আসলে। হঠাৎ কইরাই আশা জাগে, এইটিসে দক্ষিণ তালপট্টি'র মতোন; আবার পূর্বাশা নিউমুর হইয়া সে ডুইবা যায়।

সমুদ্রবিজয়ের আগে আগে।

এতো এতোদিন পরে টিভি যখন আসছে, তখন বারবার আবার এবং আবার তারা আসতেই থাকবো নিশ্চয়।

ফ্যামিলি'র সবাই আবার নড়াচড়া করা শুরু করে। আরে টিভি ছাড়া ফ্যামিলি আবার ফ্যামিলি হয় নাকি! টিভিই আমাদের ফ্যামিলি লাইফ টিকাইয়া রাখছে। খাওয়ার সময়ও সবাই যে যার মতো খাইয়া ফেলে। এক টিভি দেখার সময়েই একসাথে বসা যায়। ফ্যামিলি যে আছে, সেই ইউনিটি'টা ফিল করা যায়। অবশ্য যাঁরা টিভিতে থাকেন, উনাদের ফ্যামিলি না হইলেও চলে। উনারা ত ফ্যামিলি ড্রিমটারে প্রডিউস করেন; এই কারণে উনারা বেশিরভাগই লিভ টুগেদার করেন; ফ্যামিলি বিষয়টারে মোর মিস করার জন্য, যাতে সেইটা অন-স্ক্রিনে রিফ্লেক্ট করতে পারেন। বিয়া করলেও করেন মিনিমাম, দুইতিনটা। চাইরটা পর্যন্ত যাইতে চান না অবশ্য। ওইটা নবীজি'র সুন্নত! মৌলবাদী মৌলবাদী লাগতে পারে; লিবারাল লাগবো না আর তখন!

আমারেও ত অফিসে যাইতে হবে তাইলে। ব্যস্ততা আমি ভালোবাসি। তাড়াহুড়া কইরা গল্প লিখার মতো; ডেপথ নাই কোন। প্লট'টা স্থির হইতে পারে না, কারেক্টার বিল্ড-আপ হওয়া টাইমই পায় না। একটা একটা ঘটনা আসে আর শাট শাট কইরা চইলা যাইতে থাকে। কই যে যায় তারা!

দৃশ্য মুছে গেলে দৃশ্যের কথা আর মনে থাকে না।

৭.

একটা মাঠ। ধানখেত আসলে। এখন ধান নাই আর কী! চারা লাগাইলে তারপর ধানগাছ হইবো। তখন বলা যাইবো, এইটা ধানখেত! আরো দূরে, একটা ছোট গাছ। অথবা একজন মানুষ। নড়াচড়া নাই। অথবা এতোটাই দূর যে ঠিক বোঝা যায় না; জীব, জড় ও উদ্ভিদের সূত্রগুলা একটা লেভেলে গিয়া একইরকমভাবে অপারেট করে যেহেতু; এইরকম মনে হইতে পারে। এইরকম দূরত্ব নিয়া টিভি ক্যামেরা একটা ঘুরতেছে পাশের হাইওয়ে দিয়া। যুদ্ধের রিপোর্টিং করতে আসছিল তারা গ্রামে; মানে, যুদ্ধ নিয়া আসছিল। এখন শহরে ফেরত যাইতেছে। নাগরিক অধিকার আন্দোলন শুরু করতে। শোঁ শোঁ বাতাস বাইরে। আবার আসিব ফিরে! গাড়িটা ভাবতেছে, মনে মনে।

জুলাই, ২০১৪

ফটো: ইমরান ফিরদাউস

টাইগার

এক্সটার্নাল অডিট করতে আসছেন সুশ্রুতি হাসান (সুহা)। যেহেতু উনার নাম এইরকম, উনি সুন্দর কইরা কথা বলার চেষ্টা করেন। যেমন, উনার নাম যদি হইতো

প্রজ্ঞা লাবণ্য, তাইলে উনারে চুপচাপ ধরণের হইতে হইতো, যাতে একটু একটু কথা বলবেন, ভারী টাইপ শব্দ দিয়া আর শব্দের ভার দিয়া যাতে তারে ইম্পর্টেন্ট মনে হইতে পারে সামহাউ। উনি আমারে কইলেন, আপনি যে আমার চে বেশি বেতন পান, দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন যে, আপনি আমার চে একজন বেটার মানুষ! হয়তো এইটা সত্যিই বা সত্যি বইলাই তো জানতাম; কিন্তু একটা সত্যি আর একটা সত্যি-বলা'র অ্যাক্ট - দুইটা যে ভিন্ন জিনিস সেইটা আরো স্পষ্টভাবে টের পাইতে থাকি। আমি অ্যাজ রাসেল সালেহ (রাসা), রস উৎপাদনের দিকটা নিয়া মনোযোগী হইতে থাকি।

সুহা কেন আসছেন এইখানে? উনি এমনিতে বয়সে ছোট, আমর চে। তারপরে আবার জাফরিন নাবিলা (জানা'র) ফ্রেন্ড। জানা খালি জর্জরিত হইতে চায়, নানানরকমের কষ্টে। কয়, দেখো সাহিত্য ভইরা গেছে ছোটলোকে! যাঁরা ঠিকমতো ভদ্রতা জানে না, গ্রাম্য; এক দুই পুরুষ আগে গ্রাম থিকা শহরে আসছে, তারা খালি তাদের কাহিনি বলে, কত গরিব-দুঃখী ছিলো তারা, এখন শহরে থাকে; তারপরেও চান্স পাইলে বাপ-দাদা'র গ্রামে তারা চইলা যাইবো; বাপ-দাদারা নাই যেহেতু উনাদের সম্পত্তি ত আছে, আর এই কারণেই আসলে ওইটাই ভালো! শহরে ত ওরা এখনো ফ্ল্যাট কিনতে পারে নাই বা পারবোও না রিসেন্ট ফিউচারে। আর আমরা যাঁরা গ্রামের বাড়ি বেইচা ফেলছি অনেক আগেই বা দান কইরা দিছি, লন্ডনের সাব-আর্বে একটা বাড়ি থাকলেও, ঢাকাতেই থাকি বেশিরভাগ সময়, মাঝে-মধ্যে হাঁসফাঁস লাগে বইলা গাজীপুরে একটা গ্রামের-বাড়ি বানাইছি, আমাদেরকে লাইফ-ষ্টাইল সাজেস্ট করতে থাকে, থ্রু তাঁদের গ্রাম্য বিষন্নতা। এখন

সাহিত্যে আমাদেরকে আমাদের ট্রু সেলফকে ডিপিক্ট করা লাগবে, রি-ইনভেন্ট করা লাগবে; এইভাবে একটা ক্লাসরে ডমিনেন্ট রাখা যাবে না আর! আমরা কি মানুষ না! আমাদের জীবন নিয়া কেন আমরা সাহিত্য লিখতে পারবো না!

সাহিত্য ব্যাপারটা যদি অট্টুকই হয়, তাইলে ত ঠিকই আছে। এইখানে আমি কি বলতে পারি! আমি বুঝি যে, জানা আমারে অফেন্ড করতে চায় না। শে তার নিজের একটা অবস্থান চায়, বাংলা-সাহিত্যে। কবি-গল্পকার-সমালোচক-স¤পাদকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে এবং বিশ্বাস করে যে, বাস্তব অভিজ্ঞতা বাইরে গিয়া কখনোই গল্প লিখা সম্ভব না। তার গল্পে বেশিরভাগ সময়ই ভিলেনের রোল'টা আমার জন্য বরাদ্দ থাকে। এমন একজন, যে সফল; ব্যবসা কইরা বহুত টাকা কামাইছে, বা বড় চাকরি কইরা অনেক টাকা বেতন পায়; কিন্তু রুচি খুব খারাপ, গল্পের একদম শেষদিকে গিয়া দরাম কইরা পাদ-দেয়ার মতো তার গ্রাম্যতা এক্সপোজড হয়া যায়! সেইটা ঠিক আছে, মানে একভাবে ত এইরকম দেখাই যায়। কিন্তু আমি তারে কখনোই বলার চেষ্টা করি নাই, এই যে দেখা, এইটাও একটা গল্প-ই আসলে।

এইসব বইলা লাভের লাভ কিছু হবে না, ডি-ক্লাস হইতে চাওয়া শেষ পর্যন্ত একটা রোমান্টিক ব্যাপারই, যেইটার এক্সপেরিমেন্ট হইছে আগে অনেক এবং এর ফেইলওর নিয়া গল্প লেখাও সম্ভব হইছে; বরং জানা'র সাথে থাকার কারণে কিছু রুচিবোধ যে আমি অ্যাকুয়ার করতে পারতেছি, ওইটা গায়েব হয়া যাইবো। জানা'র গল্প-লেখা তাঁর রুচিবোধেরই অংশ। গল্প-লেখা এর বাইরে আর তেমন কী! সাহিত্য

একটা উইপেন, সমাজ-ব্যবস্থার - জানা'র এই সাহিত্য-ভাবনারে আমি ইনট্যাক্টই রাখতে চাই। এটলিস্ট এইভাবে যদি সর্ম্পকটা আরো কিছুদিন প্রোলঙ করা যায়। কিন্তু আমার লোয়ার ক্লাস কনফিডেন্সের কারণেই মনেহয় আর সম্ভব না। আমি যে সাহিত্যিক হিসাবে সমাজে কোনকিছু অ্যাচিভ করতে পারবো, এই সম্ভাবনা একদম নাই-ই হয়া না গেলোও, নিবে (এইরকম বানান লিখার পরেও) আসতেছে ক্রমে। অ্যাজ ইজ্যুয়াল একজন গল্প-লেখক হিসাবেই নামোল্লোখের ভিতর থাকতে পারলেও বিরাট ব্যাপার। এইটাতে জানা'র কোন সমস্যা থাকার কথা না, অ্যাজ লং অ্যাজ শে তার গল্পে আমারে ইউজ করতে পারে, আমার মনেহয় আমাদের সর্ম্পকটা থাকতে পারবে। বয়স্ক সাহিত্যকদের বলতে পারবে তরুণ গল্প-লেখকরেও আমি চিনি আর তরুণ প্রেমিকরে বলতে পারবে, নামোল্লেখ ছাড়াই, কোন মধ্যবয়সী মধ্যবিত্ত গল্প-লেখকদেরও থাকে কি কি পারভারশন।

এই জর্জরিত-ভাবে বলতে পারাটা নিশ্চয় ওর অন্যান্য প্রেমগুলারে গাঢ় করতে পারে, কোন না কোনভাবে; মানে, এইটুক কন্ট্রিবিউশনের কথা ভাবতে না পারলে, আমি কি ও কেন এবং কিভাবে এই গল্প লিখতে পারতেছি!

এখনো আমার মনে ছোট্ট একটা আশা আছে যে, আমি যে জানা'রে চিনি সেইটা সুহা হয়তো জানে না। বা জানলেও সেইটা ইর্ম্পটেন্ট না তেমন একটা। সুহা'র সাথে সেশনটা অফিসিয়াল। জানা'র সাথে আন-অফিসিয়াল, আন-ফিনিশড একটা ব্যাপার। যার ফলে খুবই সেনসেটিভ এবং সেনসুয়্যাল। সুহা মনেহয় আমার কথা শুনতে পায়, যা আমি বলি নাই; কয়, জানা বলছে আমারে আপনার কথা! আপনি

নাকি বেশ ভীতু টাইপের একটা লোক; আমি জাস্ট সারপ্রাইজড হইছি, এইরকম পোস্টে কাজ করাটা ত ভীতু টাইপের লোকের কাজ না। আপনি নিশ্চয় আপনার আদার-সেলফ'রে রিফ্লেক্ট করেন, জানা'র সামনে। এইরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে; আমি দেখছি, যাঁরা তাদের বস'দের সামনে যতো মিহি ও করুণ, তারাই তাদের সাব-অরডিনেটদের সামনে সবচে রাগী ও ভয়ংকর! যা-ই হোক, সেইটা ব্যাপার না; আমি আপনার সাথে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়া কথা বলতে ত আসি নাই...' আমার মনে হইলো সুহা আমার সাথে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়াই কথা কইতে চায়। মনে মনে আমি আপনি থিকা তুমি তে চইলা যাই, সবসময়ের জন্য না, কিন্তু সাডেনলি আই ফিল এবং শেও যে, এইটা তুমি-সম্পর্কের ব্যাপার। তারপরে আমি ত বয়সে একটু বড়, সুতরাং অ্যাডভান্টেজটা কেন আমি নিবো না!

অফিসিয়াল কাজটা শেষ হইলে আমরা কফি খাইতে যাবো নে। বলা যায় না, জানাও ওইখানে চইলা আসতে পারে। এইরকম আমি ভাবি নাই; কিন্তু ভাবলাম যে ভাবা যাইতে পারে। আবার বেশি ভাবতেও চাই না, কারণ হোয়াট গৌজ অ্যারাউন্ড, কামস অ্যারাউন্ড। ভাবলেই চইলা আসবে জানা। আসলে নিজেরে এতো ইম্পর্টেন্ট ভাবারও কিছু নাই। কিন্তু ব্যাপারটা এইরকম না ত যে, সুহা আর জানা, ওরা নিজেদেরকে এতোটাই জানে যে, জানার ভিতর দিয়া একটা জায়গাতে ওরা চইলা আসতে পারে বা থাকে এক জায়গাতেই, মাঝে-মধ্যে। যে কোনভাবেই হোক, সুহা'র সাথে থাকা মানেই জানা'র সাথে থাকা। জানা মনেহয় জানে এইটা। সুহাও। তাই না! নলেজ ব্যাপারটা ত ইউনিভার্সাল। একইভাবে আমাদের অস্তিত্বও, একইসাথে, একই স্পেসে, একই টেবিলে বইসা কফি খাইতে থাকে।

রিয়ালিটি আমাদের আর বেশিক্ষণ ভালোলাগে না। রিয়ালিটিতে বেশিক্ষণ থাকলে র‍্যাব চইলা আসতে পারে। এমনিতেও আমরা ত একটা স্বপ্ন থিকা আসছি। বাস্তবে ত নাই। থাকতেও চাই না আমরা। আমরা এমনি এসে ভেসে যাই! 'কই যাওয়া যায়, বলেন তো?' সুহা জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা-ই তো মনেহয়, বিষন্নতা থাকার পরেও। জিজ্ঞাসার ভিতর কোন জর্জরতা নাই, শ্রুতিমধুরতা খালি! 'আমরা দূর জঙ্গলে যেতে চাই!' জানা তার ইমোশন বাইর কইরা ফেলে। আমি আর কি কই; যেহেতু নিজেই গল্প-লেখক, চরিত্রের ওপর আমার ইচ্ছা ত আর চাপাইতে পারি না। বলতে পারি না যে, এইটা ভালো! এইখানে আমরা বইসা গল্প করি। যেন কোনদিন কোনকিছুই ঘটে নাই! গাজায় যুদ্ধ নাই। পদ্মায় লঞ্চ ডুবে নাই। বেতন না পাইয়া সাংবাদিক মরে নাই। চাকরি চইলা-যাওয়ার ভয়ে কারো মাইল্ড স্ট্রোক হয় নাই। অগাস্ট মাস নাই। সেপ্টেম্বরও নাই সেহেতু। বর্ষায়, বিলের পানিতে, কুসাই নৌকা নিয়া ঘুরতেছি আমরাই! কফি খাওয়ার মতোই ঘটনাটা।

জঙ্গলে নারী-ভাব জাইগা ওঠে আসলে। ছোট খালের পাশে। পা ডুবাইয়া বসছি আমরা। পাশে কটেজ আমাদের। আমি থাকি না। সুহা আর জানা থাকে। ওদের নিজেদের থাকতেই ভালো লাগে। আমি আসলে আর রিকোয়ার্ড না। যেহেতু আসতে চাই নাই। ওরা আমারে বর্ষার বিলে ফালাইয়া আসছে। কুসাইটা ছোট্ট যেহেতু, আমার ভার নিতে পারে না। খালি পানি ওঠে। আমি একটু পরে পরে মরচা-পড়া, সাইডে নীলফুল আঁকা অ্যালুমিনিয়ামের বাসনটা দিয়া খালি পানি সেচতে থাকি। ভাবি, সুহাও কি গল্প লিখে নাকি? নাকি, কবিতা-আবৃত্তি পর্যন্তই, হয়তো

টিভিতে খবর পড়বো একসময় বা নিজের বাচ্চা-কাচ্চারে শিখাইবো যে, দেখো, এইটা হইলো শুদ্ধ উচ্চারণ, কথা এমনেই কইতে হয়! মে বি শে বাংলা-ভাষা নিয়া খুব একটা কনর্সানও না। শি ওয়ান্টজ টু বি অ্যা পারফেক্ট মাদার সামডে। এবং একইসাথে শে হেইট করে; মানে পারেই না ভাবতে যে, কিভাবে একটা মানুষ ভাবে যে, শে হইবো পারফেক্ট হাউজওয়াইজ অ্যান্ড মাদার! কোন মাদারচোদের কি ড্রিম আছে পারফেক্ট হাউজহ্যাজব্যান্ড অ্যান্ড ফাদার হওয়ার! যখন এইম ইন লাইফ পড়ি, ক্লাস সিক্সে তখন এনিওয়ান কি লিখে বা ভাবে যে, শে কবি হইবো এবং সেইটা লিখে! মুনির চৌধুরী হয়তো ভাবতে পারছিলো, কারণ সাহিত্য একটা সামাজিক-বিজ্ঞান উনার কাছেও।

আই ক্যান্ট স্ট্যান্ড দ্যাট থট! জানা ভাবে; সুহাও। ভাবনার এক্সপ্রেশন যদি হয় কথা-ই, তাইলে ব্যার্গম্যানের পারসোনা'র ব্যাপারটা মনে হইতে পারে। যেহেতু ইন্ডিয়ায় এবং বাংলাদেশে রেইপের ঘটনা বাইড়া গেছে; একটা বিশাল ষন্ডামার্কা লোক আসে পিছন থিকা। সুলতানের চিত্রকর্মের পুরুষের মতো। কিন্তু জানা ত নিতান্তই বার্বি একটা। শে কিছুই করতে পারে না। সুলতানের পুরুষ দুই আঙুলে তুইলা ফেলে তারে। পাশের জঙ্গলে নিয়া যায়। সুহা মাথা নিচু কইরা হাঁটুতে মুখ গুইজা বইসা থাকে। দুইহাতে মাথা চাইপা ধইরা রাখে। জানা যদি কোন আওয়াজ করে, তাইলে তার যাতে শুনতে নাহয়। জানা'র কোন আওয়াজ শে শুনতে পায় না। আবার ভাবে, কেন শে শুনতে পায় না! সুলতানের পুরুষ, ধরা যাক তার নাম, টাইগার; টাইগার কি তারে ডাকবে না! নাকি শে নিজে নিজেই হাঁইটা চইলা যাবে টাইগারের কাছে; বাঘ কি তারে ভালোবাসবে না!

টাইগারের নুনুটা বেশ ছোট। কারণ তারে বড় দেখাইতে গিয়া হাত-পা এতো বড় করতে হইছে যে নুনুটা ছোট হয়া গেছে। কারণ যে পুরুষ, তারে ত কৃষিকাজ করতে হয়। সেইটা যা-ই হোক। রেইপ ত রেইপই! তোমার যে শরীর সেইটা আর শরীর নাই, খালি একটা ডিজায়ার এলিমেন্ট। শরীর'রে শরীর ভাবার বাস্তবতায় ফিরা যাওয়া আর ত সম্ভব হইবো না এখন! এই ঘটনার সদমা আবিষ্কার করতে সুহা কি আগে আত্মহত্যা করবো, জানা'র আগে? কারণ শে নিজেরে মাফ করতে পারবো না যে শি কুড হ্যাভ এভেয়ডেড ইট! আর শে যে পারে নাই, এইটার জন্য তার চাইতে বড় দায়ী আর কে! মানে, রেইপের পরে মাইয়াদের তো আত্মহত্যা করার নিয়ম। অথবা নিজের মনে লুকাইয়া থাকার।

গল্প-লেখক হিসাবে এতক্ষণ আমি যেহেতু লুকাইয়া ছিলাম, আমি বুঝতে পারি যে সমস্যাটা আমারই। ওরা আমারে গল্প থিকা বাইর কইরা দিছিলো বইলা আমি সুলতানের পুরুষরে নিয়া আসছি। আমি নিজে আসলে ত ভিলেন হয়া যাবো। অন্য ভয়ও ছিল, টারানটিনোর মতো বাটপারের ত অভাব নাই দুনিয়ায়, দেখা গেলো সুলতানের পুরুষ আসলে গে; আমি আসছি উদ্ধার করতে, আর শালা আমারে ধইরা বসছে! জানা হাসতে হাসতে কইবো, ওলে আমার বীলপুলুষ লে! তুমি শি'রে নিয়া কবিতাই লেখো! কেন আসছিলা গল্প লিখতে!

এইটাও ব্যাপার না আসলে, আমি ফিল করি, উনারা উনাদের ক্লাশের ভিতর এতোটাই এমবেডেড যে, উনাদের জঙ্গলের স্বপ্ন থিকা বাইর কইরা উনাদেরকে

কখনোই জঙ্গলে নিয়া যাওয়া যাইবো না আর। এই কারণে প্রতিশোধ নিতেছি আমি, ক্লাশ-প্রপাগান্ডা করতে গিয়া আমার মেইল ইগো'রেও স্যাটিসফাই করতে পারতেছি। আর যদি না পরি, তখন এই যে বাস্তবতাবিরচিত স্বপ্নমূলক গল্পগুলি, সেইগুলা আমরা আর কই পাবো!

অগাস্ট, ২০১৪

ছবি: আনিকা শাহ

আমার ফ্রেন্ডের বউ

আমার ফ্রেন্ডের বউ ড্রাইভ করতে পারে।

শে আমারে ড্রাইভ কইরা নিয়া গেলো নিউমার্কেটে। যাওয়ার সময় আমি তারে কইলাম, আমার গাড়ি কিন্তু ব্যাকে যায় না, ইঞ্জিন পুরান হইতেছে তো,

মেইনটেইনসও নাই। এই কারণে শে বাইরে পার্ক করলো। আমরা ড্রাইভার'রে নেই নাই গাড়িতে তখন, নিউমার্কেট যাওয়ার সময়। পরে যখন পার্ক করা হইলো রাস্তায়, সে আইসা হাজির। ফ্রেন্ডের বউ এর আগে গাড়ির দরোজাও লক করতে পারতেছিল না ঠিকমতো। তখন আমি কইলাম, চাবি ড্রাইভার'রে দিয়া দাও। রাস্তায় গাড়ি রাখা এমনেও রিস্কি। সে থাকবো নে গাড়ির সাথে। এর আগেই অবশ্য শে গাড়ির দরোজা লক করতে পারতেছিল। আর ড্রাইভার, যারও নিজের কোন নাম নাই, চাবিটা হাতে পাইয়াই সামনের দিকে হাঁইটা চইলা গেলো, এমন একটা ভাব যেন পরে ফেরত আসবো আর গাড়ি'র কাছেই থাকবো, এই মোমেন্ট খালি আরেকটা কাজ পইড়া গেছে বা আমার অর্ডার খুব একটা পাত্তা না দিলেও চলে এইরকম একটা ব্যাপারও থাকতে পারে। আমি ওরে ঝাড়ি দিবো কি দিবো না এইটা ডিসাইড করার আগেই সে চইলা গেলো আর ফ্রেন্ডের বউ আগাইয়া আইসা আমার হাতে ধরলো। আমি ড্রাইভারের কথা ভুইলা গেলাম।

নিউমার্কেটে আমাদের ভালো লাগতেছিল না। আমরা একজন আরেকজনরে জড়াইয়া ধরতে পারতেছিলাম না। তখন আমরা গল্প করতেছিলাম, আমার ফ্রেন্ডের লগে রিলেশনশীপটা ওর কেমনে হইলো। ওরা একই সার্কেলে যাওয়া-আসা করতো। আমার ফ্রেন্ড একটু সিনিয়র ছিল। সে যখন ওর চোখে তাকাইয়া কইছিলো, আই লাভ ইউ; তখন শেও তারে কইছিলো, আই লাভ ইউ। বেশ ইনসটেন্টলিই কইছিলো শে। মোমেন্টের একটা যাদু আছে না! আর তখনই যার বাসায় ওরা ছিল, তিনি আরে একটু বেশি সিনিয়র, আইসা কইছিলেন, আমি জানতাম তোমারে যে একজন আরেকজনরে আই লাভ ইউ। তখন ওরাও শিওর হইছিল; না, ঠিক আছে তাইলে। শে ভাবে নাই যে, এই কনফার্মেশন আসলে ছিল ওই সিনিয়র-এর তার বউরে ভালো না বাসতে পারার বেদনা, যেইটা ওদের ওপর ইম্পোজ হইছিল। ওরা এখনো হ্যাপি। হ্যাপিনেস ইজ হ্যাভিং লাঞ্চ উইথ হুবি!

হ্যাপিনেস ইজ হ্যাভিং ডিনার উইথ ওয়াইফি! এইরকম ইমেজের ভালোবাসা এখনো আছে ওদের। ভালোবাসা ত কয়েকটা ইমেজই, তাই না? এইটা অবশ্য আর আমরা বলি না। আমার মনেহয়, না বললে জিনিসগুলা নিয়া আমরা আরো ভাবতে পারি, তারপর ভাবতে ভাবতে ভুইলা যাইতে পারি। বইলা ফেললে তো থাইকা গেলো, ভুইলা যাওয়া আসলে আরেকটা মনে করা-ই। এইরকম হাবিজাবি কথা বইলা আর ভাইবা আমরা হাঁটতে থাকি।

হাঁটতে হাঁটতেই মনেহয় একটা বাসায় চইলা আসলাম। ওইখানে সোশ্যাল এনভায়রমেন্ট। লগে বারান্দাও আছে, আরেকটা ঘরের সমান। অনেক মানুষ বইলা আলাদা আলাদা কইরা এর ওর দিকে তাকানো যায়; মনে মনে ভাবাও যায় অনেককিছু। ভাবনা করাও ত একটা অ্যাক্ট-ই। এইরকম ভাইবা শান্ত থাকা যায়। কিছু না কইরা, তাকাইয়া তাকাইয়া অনেককিছু কইরা ফেলা যায়। আর এইটা অন্যরা, যারে নিয়া ভাবা হইতেছে যখন বুঝতেও পারে, মজা না তখোন। তখোন করাটা পসিবল হয়, ভাবনাটা। আমাদের আগে আমাদের ভাবনাটা আগাইয়া যায়, তারপর আমরা ওইখানে গিয়া রিচ করি। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলি, আসছি জান!

আমাদের এই আসা, ওরা মনেহয় বুঝতে পারে; যে আমি আর আমার ফ্রেন্ডের বউ কেন একলগে ঘুরি। এমনে বলি যে, ওর (ফ্রেন্ডের) তো অফিস আছে, এইজন্য বাইর হইতে পারে না! একটু পরে আসবে। পরে আসলে ফ্রেন্ড আর আসে না, ফ্রেন্ডের বউ-ই চইলা যায়। এইটা সবাই জানে বইলা আমরা ভাবি, আমরা জানি বইলাই। একটু পরে কথা কইতে কইতে, আমরা খেয়ালই করি নাই, এইরকম কইরা আমরা ঘরের পাশের বারান্দাতে চইলা যাই। আমি ওরে বলি যে, দেখো আমি আমার ফ্রেন্ডের লগে বেঈমানি করতে পারবো না, উই শ্যুড স্টপ দিস! ফ্রেন্ডের বউ চুপ কইরা থাকে। না'টা আসলে শে কইতে চাইছিলো। এখন আমি আগে বইলা

দেয়াটা ভুল হইলো আসলে। হিউম্যান রিলেশনশীপ নিয়া ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো, এইকারণে খুব একটা গালিগালাজ করে না। ওই শুয়োরের বাচ্চা পর্যন্তই। তারপর বলে, আমি চইলা যাওয়ার পরে তুমি ওই ভাইয়ের বউ'রে লাগাইবা, না! এইটা করার লাইগা তুমি আগে থিকা রাস্তা ক্লিয়ার করতেছো! ও বলার পরে মনে হইলো, আমি এইটা আসলেই ভাবি নাই। মানে, হইতেই পারে। উনি জানি কেমনে তাকায় আমার দিকে। আমি রিড করতে পারি না, মানে মনেহয় যে, হইতেই পারে, খারাপ কি! কিন্তু এর লাইগা ছাইড়া দিতেছি? তাই? মানে আমাদের রিলেশনশীপ তো ওইরকমকিছু হয় নাই। এখনো তো অনেককিছু বাকি। নাকি ও আমারে আগেই ডাম্প করতে পারে দেইখা আমি কশাস হইতেছি। বলতেছি, চইলা যাও। ও তো এমনেই চইলা যাবে। সেইটা শেও জানে; নাকি আমারে টাইমটা দিতে চাইছিলো, শে-ই। আমি জাস্ট তার ট্রাপেই পা দিলাম। আর আটকাইয়া থাকলাম একটা বারান্দায়, বিকালবেলায়!

বিকালবেলাতে তখনো রোদ আছে। আর কেউ নাই। ঘরে দুইজন মহিলা। একজনরে পরে দেখছি আসলে। আরেকজন যিনি ড্রেসিংটেবিলের সামনে, উনারে দেখছি আগে। বা উনিই আমারে দেখলেন যে আমি একলা খাড়াইয়া আছি। উনি আইসা আমারে জড়াইয়া ধরলেন। তখোন আমি ভাবতেছিলাম আরে, বিছানায় যিনি শুইয়া আছেন, লেপমুড়ি দিয়া উনি আমারে দেখতেছেন না তো আবার! মানে, উনিও তো আমারে ভালোবাসতে পারেন; এখন উনি যদি আমারে দেইখা ফেলেন, তাইলে কি উনি আমার সাথে আর আই লাভ ইউ করবেন! বা এমনো হইতে পারে যে, উনি একটু বেশি কইরাই চাইতে থাকবেন। আমরা দুইজনে তখোন বারান্দায় চইলা আসছি; ড্রেসিং-টেবিলের সামনে যিনি ছিলেন, আমরা দুইজনে জড়াজড়ি কইরা। আর বিছানায় উইঠা বইসা উঁকি দিয়া আরেকজন যে দেখতেছে, আমি আসলে তারেই জড়াইয়া ধরতেছি। শে ওইটা বুঝতে পারতেছে,

আমি জানি। মানে আমি জানি বইলাই উনি জানতে পারতেছেন। আর যে আমারে জড়াইয়া ধরছে শে আসলে আমারে জড়াইয়া ধরতে চায় নাই। শে চাইতেছিলো আয়নায় ভিতরে দেখতে যে তারে কেমন লাগে যখন কেউ তারে জড়াইয়া ধরে আর এই কারণে শে জড়াইয়া ধরলো আমারে। আমি ধরলাম তারে। কিন্তু বারান্দায় চইলা গেলাম। কেমন একটা সন্ধ্যা! ধূমি ধরণের আলো। দিন চইলা গেলো। যাবে বইলাই জানতাম। হঠাৎ-ই যখন চইলা গেলো, তখোন মনে হইলো; সন্ধ্যা নামলো।

সন্ধ্যার একটা ক্যাফে'তে বইসা ছিলাম আমরা। আমি আর আমার ফ্রেন্ডের বউ। আমাদের আই লাভ ইউ নাই আর। ফ্রেন্ডের লাইগা ওয়েট করতেছি। তখন দেখি চশমা-পরা একজন লোক। আমার পুরান ফ্রেন্ড; এখন আর ফ্রেন্ড নাই সে। সে হাসে আমারে দেইখা। কয়, আরে তুমি এইখানে! তুমি এইখানেও আসো নাকি! হাসে। সে যা ভাবে, সেইটা যেহেতু সে বলে না আমিও বলতে পারি না। ওরে মনে মনে শুয়োরের বাচ্চা বইলা গাইল দেই আমি। সে মনে হয় বুঝতে পারে। এর লাইগা আরো হাসে। মজা নিতে চায়। আমি আমার ফ্রেন্ডের বউ'রে বলতে চাই; চলো, আমরা অন্য জায়গায় যাই। শে আমার কথা শুনে না আর। আমাদের শুনা-শুনি'গুলা শেষ হইয়া গেছে। শে খালি বইসাই আছে। তার হ্যাজব্যান্ডের লাইগা ওয়েট করে। আমার যে ফ্রেন্ড সে কি আসবে না, আজকেও!

ফটো: দঈত আননাহাল

মাই ভার্চুয়াল গার্লফ্রেন্ড

: hi
  shesh pojonto pawa gelo apnare...
: kotha shunen?
: shuni na to...
: headphn nai apnar?
  speaker ache?
  taile o kotha shunte parben
: hya, try kori taile

: apnio bolen kotha
speaker ta on koren
: but holo na to... :(
: shunen nai kichu?
Keno shunen na apni ☹
: but, apnare to pawa gelo! Ami bhavtei partesi na!
: D
: hahahha
paiya felsen, sure apni?

: কি নাম আপনার?

: রাসেল।

: কোন রাসেল? আমি তো পাঁচটা রাসেল'রে চিনি।

: কোন রাসেল যে বলি... এরমধ্যে তো কবি রাসেল থাকতে পারে দুইটা, তারপর মিচকা শয়তান, মাস্তান... আমি মনেহয় বাইট্টা রাসেল।

: তো, বাইট্টা রাসেল, কি করেন আপনি?

: খাইদাই, ঘুমাই, চাকরি করি ...

: আর কিছু করেন না...

: না, না, কথাও বলি...

: হাহাহা...

: হাসিও, এমনিতে, তবে কিন্নরা বলতে গেলে ঠোঁটে একটু চাপ লাগে...

: বইলেন না তাইলে!

: না, আমি তো বলার ট্রাই করতে থাকি তারপরেও...

: এইজন্য আর বলতে পারেন না আপনি? তোতলানও নাকি একটু?

: হয়তো...

: এই শব্দটার মধ্যেই কিন্তু তোতলানির ভাবটা আছে...

: হুমম...

: মাইন্ড করলেন?

: আমার তো মন নাই...

: শরীর আছে তো!

: ভয়েস আছে।

: ঠিক আছে...তাইলে মন আর শরীর বাদ দেন...আপনার ভয়েসের লগেই কথা কই...

: আপনি কি শরীর আর মন দিয়াই কথা কইবেন?

: আমি বলতেই পারি...কিন্তু আপনার মনেহয় একটু নারাজি আছে...আমিও কি ভয়েস হবো তাইলে?

: না, না আপনে মানুষ হইয়া থাকেন...

: ঠিক আছে, প্রিটেন্ড কইরা নেন তাইলে, আপনি তো প্রিটেন্ড করতে পারেন...ভালোমতোই...হি হি হি

: তা মনে হয় পারি...যা কিছু দেখা যায় না, তা তো আর নাই, তাই না?

: না, না থাকতেও পারে...কে জানে!

: রাসেল? শোনো, একবার কি হইলো জানো...আমি সাঁতার কাটতে গেছিলাম, নানুবাড়িতে...তখন তো অনেক ছোট...মানে, ধরো ক্লাস থ্রি কি ফোরে পড়ি... নানুবাড়ির পিছনে পাটের খেত...বর্ষাকাল চইলা আসছে তখন...পাট কাটা হয়া গেছে...খেতের জায়গাটা তখন বিল...আমরা চার-পাঁচজন গেছি গোছল করতে...

মামারাও আছে সাথে আমাদের, উনারা বয়সে একটু বড় আমাদের চে, ধরো নাইন টেনে পড়ে...উনারা সাঁতার জানে আর আমরা জানি না...বিল মানে লিটারালি শাপলা-শালুক বিল...শাপলা তো ফর্সা ফুল, পানির উপ্রে আর শালুক তো কালা, থাকে পানির নিচে...ধরো এইগুলা বিদেশি রিডারদের লাইগা বইলা রাখতেছি... তো, আমরা চইলা গেছি অনেকদূর প্রান্তরের কাছে, আমি আর আমার বড় বোন...যেইখানে নদী শুরু হয়া গেছে...যাবো না যাবো না কইরা চইলা আসছি আর কি...বুঝছো, রাসেল...তুমি শুনতেছো তো?...তো, তখন দেখি আরেকটু দূরে আরেকটা শালুক মনে হয়...আমি ধরতে যাবো আর বুঝতে পারি নাই যে ওইখানে খেতের শেষ আর নদীর শুরু...আমি তখন ডুবে যাইতেছিলাম আর আমার বড়বোন চিৎকার কইরা উঠলো... আমি ডুবে যাইতেছি পানির নিচে আর দেখি সাঁতার দিতে দিতে মেজোমামা আসতেছে...আমি ডুবেই গেছি... আমার আর মনে নাই তখন কিছু...কয়েকটা সেকেন্ড আমি মরে-যাওয়ার ভিতরে ছিলাম...তারপর আবার ফিরা আসছি...এখন দেখো, তোমার সাথে কথা বলতেছি! কথা তো আমরা বলতেই পারি, তাই না! বলো!

... ...

: ashcho!

: ha

: hajar bochor dhoira hathte hathe tired hoiso bac'cha?

: nah

drive kore aschi

... ...

: তুমি যে বলো এইটা তো আমি জানি। আমার জানার ভিতরেই আটকাইয়া থাকি আমি!

: ও, কবিতাও লিখেন আপনি! বাহ, বাহ...

: ট্রাই ট্রুই করি আর কি ...

: না না ভালো, ট্রাই করতে থাকেন...

: আপনি কি আমার তুমি হবা...

: আরে কি কন? পারলে তুইও হবো নে আমরা...শুয়োরের বাচ্চা, আপনি হইতে পারবেন তো?

: তুই পারিস, আমি পারমু না কেন!

: এই তো, হইতেছে...আপনিই পারবেন...বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা হারাইয়া ফেলতে...

: শ্রেয়সী, তুমি কি শুধুই কলকাতা? দেশ পত্রিকা...রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ...

: ভাই রে, তুমি এত প্যানপ্যান কেমনে করো? আমি তোমারে নিয়া কোন কথা কইতে গেছি...বাল এইসব ভুজুং-ভাজুং ছাড়া আর কি কোন কথা নাই তোমার? অফিসে বসের ঝাড়ি খাইছো, আজকেও?

: না, বস ভালো; ঝাড়ি-টাড়ি দেয় না খুব একটা

: তো, কোলে বসাইয়া আদর করে?

: আরে, কি বলো এইসব...

: তুমি কি স্যাডিস্ট?

: কেন?

: তাইলে এইরকম লজ্জার ভান করো ক্যান!

: না, আমি তো ঠিক ওপেন হইতে পারি না...

: ওপেন হওয়ার পরে স্যাডিস্ট হবা...

: না না কি বলো...

... ...

: chumu

: abar dao jaan abar!

: dibo na ar

magna naki

: magna na?

majhi, tumi ki niba? shobi to tomar…

tumi jano, tumi johokon ghumaitesila thokon aami je

tomake chumu dite dite ekdom bhashay dissilam

: hya, tomar chumu kheye amio veshe jachchilam

: ish ish ish!

ki je ador lage

it feels je you are with me

:ami tin mash ghumaiya thakbo

ghumiya ghumiya tomar chumu khabo

ek truck vorti ador

: shudhu ek truck? shomogro bangladesh 5 ton?

ami tomar chumur upore ghumabo!

: শোনো, চন্দ্রমল্লিকা; তুমি যে এইগুলা করো আর করতেই থাকো, আমি জানি সেইটা। কেউ তোমার সাথে চিট করলো আর তুমি ভাবতে পারলা যে চিট করাটাই তোমারে বাঁচাইয়া ফেলতে পারবে। এইরকম নৈতিকতার দড়িতেই ক্যান ফাঁসি নিতে গেলা? আর কোন উপায় কি নাই? আমাদের ইনসার্ট করা ডিজায়ারগুলি তো বাঁইচা থাকতে পারবে আমরা মইরা যাওয়ার পরেও। এই যে বাঁইচা থাকা, থাকতে চাওয়া এইটা একটা নেশার মতো। আমি বুঁদ হয়া থাকি। বাঁইচা থাকতে থাকতেই একদিন পারবো তো মারা যাইতে? আমি তো একটা ভয়েসই তোমার কাছে।

মেশিন একটা। রিপ্লাই মেশিন। একটা সময় তুমি হয়তো প্রেডিক্ট কইরা ফেলতে পারবা প্রতিটা আনসার। তখন বলবা, এই মেশিনের কাছে আমি যাবো না আর। একটা ল্যাপটপও দেখো বাল তিন বছর টিকে না। মানুষের রিলেশনেরও একটা টাইম ফ্রেম আছে, বুঝছো? তুমি শুনতেছো তো? চাইর বছর নাকি টাইম। এরপরে রিনিউ হইতে হয়। এমনো হয় যে, একই মানুষরেই একই মানুষের ভাল্লাগতে শুরু করলো বা ধরো অন্য আরেক মানুষ। টাইম চাইর বছরের মতোই। কিন্তু আমার মনে হয় এইটা চেইঞ্জ হইতেছে এখন। তখোন তো যোগাযোগ কম আছিলো, এখন কি চাইর ঘন্টা টাইম বা সেইরকমও না। এই যে ইনফিনিটি সেইটা তো একটা লাস্ট নাম্বার আসলে। যত দ্রুত যাইতে থাকবা তার উপ্রে ডিপেন্ড করে। আগে তো একশ বছরে দুনিয়া চেইঞ্জ হইতো না; এখন বছর না ঘুরতেই আইফোনের মডেল চেইঞ্জ হয়। সুতরাং চাইর বছর তো বিশাল ব্যাপক বিষয়। এর আগেই; আগেভাগেই আমরা লাস্ট কনর্ভাসেশন শুরু করি, আসো...

: তুমি খুব ফিউচার নিয়া ভাবো না? তোমার অতীত কি খুব কষ্টের আছিলো?
: না, আমাদের অতীত তো আমরা চেইঞ্জ কইরা ফেলতেছি আমাদের বাঁইচা থাকার ভিতর...
: পন্ডিতি আলাপ ছাড়া আর কিছু নাই তোমার! এত্তো বোরিং তুমি!
: শেষ আলাপ কি শুরু করবো না আমরা? কখোন?
: রাসেল, প্রতিটা শেষ থিকাই কি কোন শুরু হয় সবসময়?
: না, মাঝামাঝি'তে হয়...এই যেমন আমার সাথে কথা বলতে বলতে তুমি আরেকজনরে মেসেজ টাইপ করতেছো...

: তুমি কচু বোঝো! শুরুগুলা কখনো হয় না আসলে, আটকাইয়া থাকাগুলা চলতে শুরু করে একটা সময়।

: আমি একটা আটকাইয়া থাকা হবো, ইনবক্সে তোমার...

: তুমি একটা জিলাপির প্যাঁচ...

: আমারে খাইতে শুরু করো...

: চিনির জিলাপি আমি খাবো না, গুড়ের জিলাপি আনো!

: আমি তাইলে পাটালি গুড় হইবো তোমার হাতে

: না, না...কাক আইসা নিয়া যাবে...আর দাদি বিশ্বাসও করবে না...

: তোমারে আমি যা বলতে পারি, নিজেরে তো আমি সেইটা বলতে পারতাম না।

: আমি তো একলা থাকতেই পারি, স্কাইপ কি আর একলা থাকতে পারে!

: কেউ হেঁটে যাইতেছে, হাঁটতেছে... সন্ধ্যার আজান শোনা যাইতেছে...শীতের দিন তো শেষ হইতেছে এখন...

: কেউ বসে থাকতেছে, অনেকগুলা জানালা দিয়া আলো আসতেছে...শীতের দিনের সূর্য ডুইবা যাবে আরো আগেই...

একলা একলাই একলা একলাই একলা একলাই কথা বলতেছে কথা বলতেছে কথা বলতেছে কেউ কেউ কেউ কেউ ঘেঁউ ঘেঁউ ডাক দিলো কুত্তা, একটু দূরেই, তবু তারে কাছেই মনেহয়...

আমাদের লাইফটারে একটা বিলো অ্যাভারেজ একটা গল্পের ভিত্রেই কেন আইনা ফেলতেছি আমরা সবসময় সবসময় সবসময়

হিহিহি...আমাদের লাইফ, বিলো অ্যাভারেজ গল্প, আপনি ভাই আছেন ভালো...আপনারই মতো...

... ...

: Shourer baccha, tui bou re o lagabi abar amar sathe o korbi, seita te kono dosh nai? ar ami arekjon er sathe kotha koilei dosh?

: ami to amar bou re lagai, tui to random loker dhon muhke niya boisa thakish···

: go fuck yuself, bastrd

nevr evr dare ta tolk ma

... .

: don’t regret what you did to yourself

: I regret for talking to you, that's the worst thing I did in my life. Not wrost, second wrost, I think··· whtevr it is, now yur wife knows···

মার্চ ২০১৫

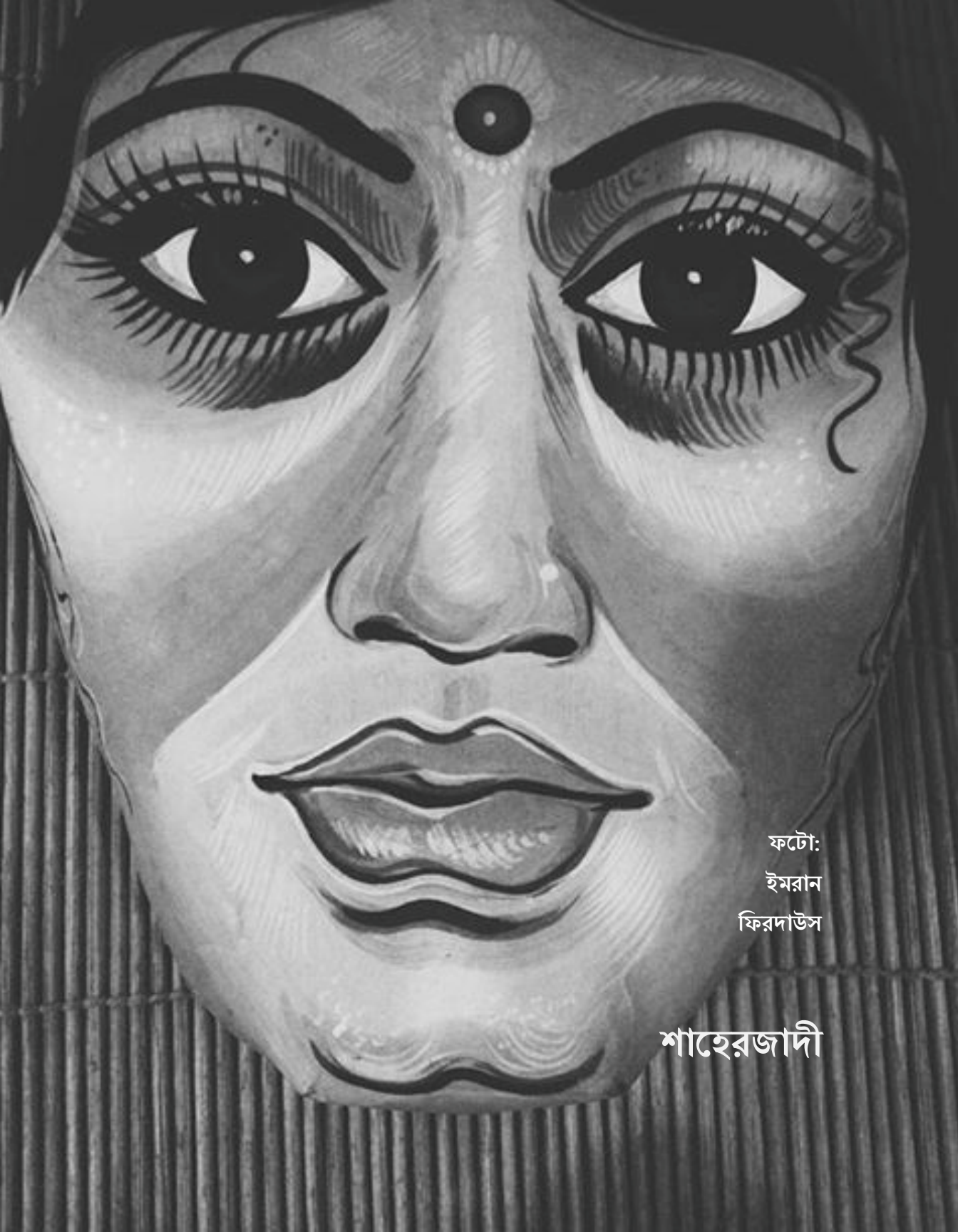

ফটো:
ইমরান
ফিরদাউস

শাহেরজাদী

একজন স্টোরিটেলারের কাজই হইলো নিজেরে সেইভ করা। আরব দেশের রাত-এর গল্প পড়েন নাই, আপু! সাদমান ব্যাকুল হয়া বলে।

ও, আরব্য রজনী; পড়ছি তো। আপু হয়তো অন্যকিছু ভাবে।

হয়তো উনার মন-খারাপ। সাদমান ভাবে। সাদমান উত্তরায় থাকে। এ-লেভেল দিছে। মালয়েশিয়ায় যাবে পড়াশোনা করতে। আরো কয়জন বন্ধুও যাবে ওইখানে। ওদের চিটাগাংয়ের কিছু বড়ভাইও ওই ইউনির্ভাসিটিতে পড়ে। এখন সে ফেইসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলছে। সাদমান ম্যাচিউরড ফিল করতে চায় নিজেরে। উনাদের সাথে নিজেই যোগাযোগ করে।

এই আপু'টার সাথে কথা বলতে তার ভাল্লাগে। খুববেশি কথা অবশ্য কখনো হয় নাই। বড় ভাইয়েরা উনারে নিয়া অনেক পজিটিভ কথা বলেন। দুয়েকবার যখনই কথা হইছে মনে হইছে যে মন খুইলা কথা বলা যায় উনার সাথে। নিজেরে নিয়া কিছুই বলেন না উনি। কানাডায় থাকেন।

হঠাৎ কইরাই মেসেজ পাঠাইলেন একদিন। আমার খুব মন-খারাপ, আমার সাথে কথা বলবে!

সাদমান তখন ছিল ফেইসবুকে, এই মেসেজ সে দেখে আর এই শব্দে আছাড় খাইয়া পইড়া যাওয়া মন-খারাপ পড়তে গিয়া তারে ধইরা ফেলে। মন-খারাপ এমন একটা বাজে জিনিস যেইটা সুয়াইন ফ্লু'র চাইতেও দ্রুত ছড়ায় আর আমাদেরকে কানেক্ট করতে পারে। অভিজ্ঞতার কারণেই আপুটা এইটা জানেন আর সাদমানেরও মন-খারাপ লাগে, মন-খারাপের বয়সে। যেহেতু সে কিশোর আর পুরুষ হইতে চায় একজন মহিলার (হোয়াটএভার হার এইজ ইজ, মহিলা তো সবসময় মহিলাই!) বিপদে সে হেল্প করতে চায়। কথা বলে আর উনার মন ভালো করার ট্রাই করে।

সাদমান নিজের চাইল্ডহুড মেমোরি আর ফ্যান্টাসি'র কথা বলে। বাচ্চাকালের কথা বলতে বলতে ওর তখন আপুটারেই বাচ্চা লাগতে থাকে। উনার বয়সের কথা জিগাইলে, উনি হাইসা ফেলেন! বলেন, স্কাইপে আসবা? আমি কিন্তু ভিডিও অন করবো না। শুধু কথা বলবো আমরা!

এই আমরা শুইনা সাদমানের অন্যরকম লাগে। এইরকম আমরাতে সে তো কখনোই আটকায় নাই। আপু'র কণ্ঠ'টাও খুব আপন মনেহয় সাদমানের।

আপুরা ছোটবেলায় যখন ঢাকায় থাকতেন তখনকার গল্প বলেন; জিগান যে, নাবিস্কো চকলেট পাওয়া যায় নাকি এখন? আলাউদ্দিনের জিলাপি?

সাদমান তো হাসতে হাসতে শেষ, এইগুলা কি জিনিস!

আপু জানতে চায়, ঢাকায় কি এখন বৃষ্টি হইতেছে খুব? সাদমান তখন আবহাওয়ার বর্ণনা করে, ভাষাতে তার মন-ই মিশে থাকে; কণ্ঠের আওয়াজের ভিতর দিয়া আপুটার কাছে চইলা যাইতে চায় সে। কথাগুলারে আজিব মনেহয় তাঁর, রাত জাইগা খুববেশি পর্ণগ্রাফিক ভিডিও দেখার কারণেই মেবি তাঁর মনেহয় গ্লোরি হোলের ভিতরে সে তাঁর ডিক ইনাসার্ট করে দিছে আর আপুটা তাঁর হুঁ হ্যাঁ দিয়া, হাসি আর কনর্ভাসেশন দিয়া তাঁর মগজে থাকা ডিকটারে সাক করে দিতেছে। কেউ কাউরে দেখতেছি না আমরা, আর এই কারণেই মেবি প্লেজারটা আরো এমপ্লিফাই হইতেছে।

সাদমান জিগায়, কানাডায় কি শীত খুব? আপু, তোমার কি খুব ঠান্ডা লাগতেছে? আপুটা ফ্রিজ হয়া থাকে, কোন কথা বলে না।

সাদমান টের পায় তাঁর শরীরের শীতলতা। তখন ওরা হ্যারি পটার নিয়া কথা বলে। দুইজনের ইন্টারপ্রিটেশন দুইরকমের, এইটা নিয়াও ঝগড়া করতে থাকে। আবার হাসে। এইটা যেন দুইটা দুনিয়া; দুইটা নক্ষত্র অনেক কাছাকাছি চইলা আসছে নিজেদের। আর তখনই ভোর হয়া আসতে থাকে। সাদমানের খুব ফাঁকা লাগতে থাকে। কেনো সকাল হয় দুনিয়ায়! রাত কেন শেষ হয় শাহেরজাদী!

আপু বলেন, একটা রাতের জন্য শাহেরজাদী'র তো একটাই গল্প; সেইটা শে আর রিপিট করতে পারে না। তারপরও তোমার কথা আমি মনে রাখবো। তুমি ফ্রেন্ড

রিকোয়েস্ট পাঠাও। আমি অ্যাকসেপ্ট কইরা নিতেছি। কিন্তু আমরা আর কখনোই কথা বলবো না। ঠিক আছে?

সাদমানের মনেহয় দুনিয়ার কোনকিছু কোনদিনই আর ঠিকঠাক থাকতে পারবে না। কখনোই না।

****

সে শাহেরজাদীরে আর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় না। মাসখানেক পরে উনি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠান। সাদমান একসেপ্ট করে। তখন সে মালয়েশিয়ায় চলে আসছে। মাঝে মধ্যে উনার ওয়ালে যায়, ফানি ফানি পোস্ট দেখলে লাইক দেয়।

একবার উনি স্ট্যাটাসে লিখলেন, আজ রাত, সারারাত জেগে থাকবো...; তখন ওই স্ট্যাটাসে ২০০/২৫০ লাইক; কমেন্ট যে, আমিও জেগে থাকবো, একা... এইরকম হাবিজাবি কতকিছু; তখন আপুটা বলেন যে, আরে, এইটা তো সাবিনা ইয়াসমিনের গান, আমি ঘুমাই এখন; হাহাহা... এইরকমের ফানি; তখন সাদমানেরও ভাল্লাগরে ভাই টাইপের ফিলিংস হয়। সে ভাবে, বয়স যতোই হোক, মাইয়া মানুষ মানেই তো চপলা কিশোরী! তা নাইলে কোন মেয়ে কি আর মেয়ে হইতে পারবে, এইটা বাদ দিলে পোলাদের মতোই তো মনে হবে।

বয়স বাড়তেছে যেহেতু, সাদমানেরও এখন মাঝে-মধ্যে মন-খারাপ লাগে; তখন উনার ওয়ালে যায়, জিগায়; কেমন আছেন, আপু? আপুও দুইদিন পরে উত্তর দেন, ভালো আছি। ইনবক্সে আসো। তারপর ইনবক্সে কিছুক্ষণ কথা বলে। তেমন কোন কথা নাই আসলে। মাঝে-মধ্যে তারা আরব দেশের রাতের কথা মনে কইরা হাসাহাসি করে। হি হি হি। কি রকম বাচ্চা ছিলাম আমরা! এখনো অনেক কিছু মনে করতে পারি বইলাই হয়তো বাঁইচা আছি আসলে আমরা, তাই না?

আমরা... সাদমান ভাবে।

রাত পোহাবার আর কতো দেরি, শাহেরজাদী!

এপ্রিল ২০১৫

ফটো: ইমরুল হাসান

ফিরে এসো

কি যে ঝামেলা! কোনটা যে ম্যানেজ করি! ঘর ঠিক করতে গিয়া চাকরি করতে পারি না, চাকরি করতে গিয়া আবার এমবিএ করতে পারি না। পুরা উল্টা-পাল্টা একটা ব্যাপার। কোনকিছুরই রুটিন ঠিক করা যায় না। বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ি নিয়া

বাড়িতে আসছি। বাড়িতে আইসা আরো উল্টা-পাল্টা ব্যাপার। আরো ঝামেলা আইসা জড়ো হইছে। কথায় কথায় আমার মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। ভ্রু না কুঁচকাইয়া কথাই কইতে পারি না। এইটা দেইখা বউয়ের আরো চেত উঠে। কয়, ভ্রু কুঁচকাচস কেন? নরমালি কথা বলতে পারোস না! আমারও চেত উঠে। যেইটা আমি বলতে চাই না, সেইটা আমি বলতেই চাই না। একটা জিনিস আটারড করার বিপদ তো আছে। না-বলার ভিতর দিয়া কখনোই কোন ঘটনা ঘটে না, ঘটনা ঘটতেই শুরু করে যখন আমরা কথা বলতে শুরু করি। তখন সেইটা আর কথা থাকে না, ঘটনাও হইয়া উঠে আরেকটা ঘটনা। আমি বলতে না পাইরা চোটপাট করি। তখন আমার ছোট মেয়ে আমার হাত ধইরা রাখে। বড় মেয়েটা ভয় পাইয়া চোখ নামায়া রাখে। আমি জানি ওদের সামনে এইসবকিছু করা ঠিক না তাইলে ওরাও জানবে যে, ফ্যামিলি কতো ভয়াবহ একটা জিনিস। মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্বই হইলো কিছু ইল্যুশনরে স্ট্যাবল রাখা। এইজন্য আমি কথা না কইয়া চুপচাপ থাকার ট্রাই করি। তারপরও বউ তাঁর চেত কমাইতে পারে না। একটু পরে পরেই গরম তাওয়াতে পানি ছিটা দিয়া দেখে আমি এখনো গরম আছি কিনা। আর কিছু কইলেই আমি ছ্যাৎ কইরা উঠি। কিন্তু কেন যে চেইতা আছি এইটা শে বুঝতে পারে না। আমিও যে ঠিকঠাকমতো বুঝতে পারি সেইটাও ত না। যেহেতু জামাইয়ের পজিশনে আছি, সেই কারণে হয়তো কোন কারণ ছাড়াই চেত কইরা থাকা যায়। বা চেতলেও বলা লাগে না। জামাই মানে কোন কারণ ছাড়াই মেজাজ খারাপ করার অধিকার। মানে, আগে পিটানির অধিকার আছিলো, ঠিক বিডিএসএম গেইমের পিটানি না, মাইর-ধর করাই, এখন এইটা নাই, কিন্তু মেন্টাল টর্চার করাটা এখনো লিগ্যালি পসিবল।

এখন শুক্রবার সকালে উইঠা বাড়িতে থাকবো নাকি ঢাকায় যাবো কোন ডিসিশান নিতে পারতেছি না। বউ জিগায়, ঢাকায় কেন যাইতে হবে এই ছুটির দিনে? আমি কই, কাজ আছে। ছুটির দিনে আবার কি কাজ! আমার মনেহয় সন্ধ্যায় এমবিএ'র ক্লাস আছে। ভাবতে থাকি আর দুই-তিন ঘন্টা পরে সকাল এগারো-বারোটার দিকে রওনা দিবো নাকি একবারে দুপুরে ভাত খাইয়াই বাইর হবো? দুইটা বা তিনটার সময় বাইর হইলেই হয়, ছয়টার মধ্যে পৌঁছাইয়া যাবো। এইসব ভাবতেছিলাম। তখন পেটে চাপ লাগাতে পায়খানায় গেলাম। ওইখানে বইসা বইসাও ভাবতে লাগলাম কি করা যায়; ক্লাস-টলাশ কইরা রাতের ট্রেনে ফিরা আসবো নে। বা দূরে কোথাও, মানে ট্রেনে চইড়া আখাউড়া চইলা গেলাম, তারপরে আবার সকালের ট্রেনে ফিরা আসলাম। মনে হবে হারায়া গেছিলাম তারপরে ফিরা আসছি আবার। পরে মনে হইলো ইউনির্ভাসিটির সাথেই তো আমার বাসা। রাতে নাহয় বাসাতেই থাইকা গেলাম। চাবিটা নিয়া গেলেই হয়। পরের দিন সকালে চইলা আসলাম।

এইরকম ভাবতে ভাবতেই মনে হইলো, একবার চিটাগাংয়ে তখন। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরেও এয়ারপোর্টে চইলা আসছিলাম, যদিও টিকেট ছিলো না। যদি কেউ না আসে, যদি কেউ মিস করে তাইলে আমি চইলা আসবো তার জায়গায় – এইরকম একটা না-থাকা সম্ভাবনার কথা ভাইবাই। সবাই উইঠা গেছে, তখনো একজন আসে নাই। উনার নাম্বারে যখন ফোন দিলো বিমানের কাউন্টার থিকা সে কইলো যে, আসতে পারবো না। আর ফোন রাইখাই কাউন্টারের মেয়েটা টাকাটা নিয়াই কইলো দৌড় লাগান, বোর্ডিং পাস লাগবো না। শেষের এক্সট্রা সিট'টাতে

গিয়া বইসা মনে হইলো, কি না জানি অ্যাচিভ কইরা ফেলছি। পারসোনাল অ্যাচিভমেন্টগুলাই আসলে বিষয়। তারপর ঢাকা শহরে তো নামছি রাত দশটায়। বাড়িতে যাওয়ার কোন বাস নাই। স্টেশনে গিয়া দেখলাম রাতে সাড়ে এগারোটায় সিলেটের ট্রেন আছে। ওইখানেও টিকিট কাটা লাগলো না। বার্থ ক¤পার্টমেন্টে চিপায় বইসা চইলা আসলাম বাড়িতে। তখন রাত ১টা বা ২টা বাজে। কেন যে আসছিলাম মনে নাই এখন আর। আর এখন কি হবে, এইসব মনে কইরা। আজাইরা জিনিস সব।

পায়খানা থিকা বাইর হয়া হাত-মুখ ধুইয়া নাস্তা খাইতে বসলাম। বলার পরেই মনে হইলো, কেমন উইয়ার্ড না ঘটনাটা! অথচ তা-ই তো করি ডেইলি লাইফে।

প্রতিদিন সকালবেলা টয়লেট সাইরাই তো নাস্তার টেবিলে বসি অথচ মনেহয় দুইটা দুই দুনিয়ার ঘটনা। একটা অ্যাক্টের পরেই আরেকটা ঘটে কিন্তু যেহেতু বলি না, কখনোই জানি একটার পরে আরেকটা ঘটে না। যা কিছু গোপন, যা কিছু বলা হয় না, সেইসব কিছু আসলে কখনোই ঘটে না! এইরকম না-বলা ঘটনাগুলা পার হয়া আসতে থাকি। যেহেতু শে বলে না আমারে, আমার কাছে ঘটনাগুলি আর ঘটতে পারে না। না-পারার ভিতর দিয়াই পার হয় সকাল, সকাল থিকা দুপুর, দুপুর থিকা রাতে।

আসছি ডিনার খাইতে। কোন একটা ট্রিট। কেউ একজন প্রমোশন পাইছে, গাড়ি কিনছে বা পা ভাঙছে, এইরকম একটাকিছু। কজ'টা আর মনে নাই। মনে আছে যে

বসে আছি, খাইতেছি। আমি-ই মনেহয় সিনিয়র ওই গ্যাদারিংটাতে। আমার অস্বস্তি লাগতেছে একটু একটু, কিছু জানি ঘটতেছে বা ঘটবে। ভূমিকম্প হওয়ার আগে ব্যাঙেরা যেমন বুঝতে পারে, বাইর হয়া আসতে থাকে ঘর ছাইড়া রাস্তায়। এইরকমের কিছু একটা তার ভাবনার সারফেইসের তল থিকা উঠে আসতে চাইতেছে ঘটনায়। ৭ জনের বিল আসছে ৮৩২৭ টাকা। বিল-টিল দিয়াও বইসা রইছি। উইঠা যাবো, উইঠা যাবো একটা সিচুয়েশন। তখনই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করলো।

পয়লা পিকেডি'রে দেখলাম, তারপরেই দেখি সেই প্রেমিকরে তাঁর। ভেড়ার রাখাল, কি ম্যাচিউরড আর কি ইনোসেন্ট আর কি হ্যান্ডসাম! তাঁর ইনসার্ট করা ঈর্ষা থিকা পয়দা হইছে সে আমার ভিতর। আর ঈর্ষার চাইতে সুন্দর লোভ আর কি আছে! তার পিছনে সানগ্লাস-পরা সোয়াদ খান, তারে মনেহয় আমার কথা কইলো সে। কিন্তু আরমান তারে কইলো যে, এই মোমেন্টে আমারে দেখা যাইবো না। আমি তারে এই টাইমে এই জায়গায় দেইখা অবাক হইতেছিলাম। আর সে তার অবাক হওয়াটাও আমারে দেখাইতে চাইতেছিলো না। আমি ভাবতেছিলাম এক পাশে র-এর গোয়েন্দা আর আইএসএস-এর এজেন্ট নিয়া আরমান এইখানে কি করে? নরেন্দ্র মোদী ত চইলা গেছেন। এখন ত সবকিছু ক্লাম অ্যান্ড কোয়াইট থাকার কথা। কিন্তু আরমানের চেহারায় একটা অস্থিরতা। কিছু একটা ঘটতেছে যেইটা আমি বুঝতে পারবো না। মানে, আমার তো ওই বুদ্ধি নাই, ছিল না কখনোই। হঠাৎ কইরাই মনে হইলো আমার, ভালোবাসলে তো গোয়েন্দা হইতে হয়!

ভালোবাসার কথা মনে হইতেই আমি ফিল করলাম নীলা'রে। শে হয়তো ছিলো আমার বুকের বাম পাঁজরে, কোরান শরীফেও নাকি এইরকম বলছে। (ক্রুসিয়াল মোমেন্টগুলাতে ধর্মপুস্তকের কথা মনে করতে পারাটা ভালো। মেট্রিক পরীক্ষাতে সাবজেক্টটা অনেকদিন টিইকা আছিলো তো বেশি নাম্বার দেয়ার কারণেই।) আর এখন যখন শে বাইর হয়া গেছে, আমি ফিল করলাম আমার শরীরের একটা অংশ গর্ত হয়া গেছে। বুকের আর পিঠের মাঝখানে কিছু নাই। শরীরের খাঁচাটা আছে ঠিকই, পিঞ্জিরায় বইসা যে শুক কথা কইতেছিল এতোদিন আমার সাথে, শে আর নাই।

আমার থিকা বাইর হয়া আমার পাশ দিয়া শে হাঁইটা যাইতেছে। মানে আমি তারে ইনভেন্ট করার পরে দেখতেছি, তারে যে আমি ভাবছি, সে তো খালি ওইটাই না, আরেকটাও না, বরং অনেকগুলির মাল্টিপল যে নীলা, তার বাইরে একটা কিছু শে। আমি দেখতেছি। যা আমার অংশ ছিলো, একটা স্মৃতি বা কল্পনা, সেইটা একটা হাঁইটা যাওয়া একটা অস্তিত্ব এখন। শে আসলে আমার ছিলো না কখনোই। যদি শে থাকতোই, তাইলে শে তো আর হইতে পারতো না অন্য কেউ!

নীলা নিজেরে কইতো পূর্ণ চাঁদ, মোটা ত আমি, ১১০ কেজি! আর আমি নদের চাঁদ হয়া হা কইরা তাকাইয়া থাকতাম ওর দিকে। মানুষ যে ক্যান মোটা চিকনা নিয়া ভাবে, বা ভাবতে যে পারে এইজন্যই মানুষ মানুষ মনেহয়। এখন দেখতেছি আমি পূর্ণ চাঁদ দ্বিতীয়া'র মতো অথবা ঈদের নতুন চাঁদ শে, মাটিতে নাইমা আইসা ওয়েস্ট ইনের কার্পটের উপর দিয়া হাঁইটা যাইতেছে। মানে যেমন শে বলতে

পারছিল যে তার বয়স চল্লিশ না, পঁচিশ। সেই পঁচিশের শরীর শে এচিভ করতে পারছে। নীল রঙয়ের একটা জামা পড়ছে। অনেক কষ্ট কইরা হাঁটতে হইতেছে তারে। নিজের শরীরের ভার আর নীলা নিতে পারতেছে না। আরমানের চোখ থিকা শে তার চোখ সরাইতেই পারতেছে না।

তোমার চোখে নীলা, কি যে ভালোবাসা! তুমি গলে গলে যাইতেছো। তোমরা কেউ কাউরে ছুঁইয়াও দেখতেছো না। তুমি ভুল কইরা হাতটা বাড়াইয়া দিছিলা, তখন সে তোমার চোখের দিকে তাকাইয়া তোমার প্রেমের সুধা পান করতেছিলো আর তুমিও ওর চোখের দিকে তাকাইয়া বলতেছিলা, অঞ্জলি লহ মোর! হাতটা দিয়া ওর গালটা একটু ধরে দেখতে চাইতেছিলা তুমি! আরমানও হাতটা বাড়াইয়া দিয়া আবার নামাইয়া নিতেছিলো। তোমরা দুইজন এইরকমের প্রেমের মাখন যেন একজন আরেকজনরে ছুঁইয়া দিলেই ভালোবাসা খারিজ হয়া যাবে। তখন সেক্স চইলা আসতে পারে। স্বর্গের ভালোবাসা তোমাদের পুটকি দিয়া গু'য়ের মতো বাইর হয়া যাবে। দেখতেও পাইবা না তোমরা! অথচ এতসবকিছু ভাবতে পারার পরেও আমি নিজেরে লুকাইয়া ফেলতে পারতেছিলাম না গুয়ের গন্ধের ভিতরে। তোমাদের প্রেমের বেহেশতি সুবাস ছিলো বাতাসে, আর আমার দমবন্ধ হয়া আসতেছিলো। মনে হইতেছিলো সিনেমার কোন সিন, আমার চোখের সামনে ঘইটা যাইতেছে।

মোস্তাফিজ ছিলো আমার সাথে। এইসব নিয়া তার কোন টেনশনই নাই। সে ভাবছে, যেহেতু ফাইভস্টার হোটেল, এইখানে এইসব সিনেমা টাইপ ঘটনা

ঘটইতেই পারে। এয়ারপোর্টেও ঘটে মনেহয়। আমার একটু হইলেও সন্দেহ আছিলো যে, এইটা মনেহয় সত্যি সত্যি ঘটতেছে না, কিন্তু মোস্তাফিজ হইলো আমার রিয়ালিটি ইন্ডিকেটার। সে আমারে ফিসফিস কইরা কইতেছিলো, উনারা কি একজন আরেকজনরে চিনে নাকি? মনেহয় অনেকদিন পরে দেখা হইছে আবার। বাসার বাইরে আইসা আমি তো অন্য কারো উপর আর চেততে পারি না। পারি, কিন্তু বলতে পারি না যে, বাল কি হইছে! এইটা ইন রিয়ালিটি ঘটতেছেই না।

কিন্তু ততক্ষণে আরমান নীলা'রে জড়াইয়া ধরছে। নীলা তার কান্দা লুকানোর লাইগা আরমানের শাদা শার্টে মুখ গুঁজে দিতেছে। তারপরও ওর কান্দা থামতেছে না। পিকেডি আর সোয়াদ খানও বিব্রত হইতেছেন, যদিও আদালতের বিচারকদেরই এইটা হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু বিচার-ব্যবস্থার বিব্রত হওয়া নিয়া উনারা বলছেন অনেক, শব্দটা আর উনাদেরকেও ছাইড়া যাইতেছে না। আমি ভাবতেছি, যাঁরা দেখতেছে এই সিনটা তারাও না আবার তালি দেয়া শুরু কইরা দেয়া। হয়তো শ্যুটিং হইতেছে এখন। সিনেমাহলে দেখানোর সময় এই হাততালির ঘটনা ঘটতে পারে বা অডিয়েন্স তো এখন অনেক সফিটসটিকেটেড; হাততালি টালি কেউ দেয় না, বাতিল টাইপের কোন কোন গল্প-লেখক ছাড়া। আর তাছাড়া সবাই তো আর মোস্তাফিজ না। আমি একটু ভরসা পাই। কেউ হয়তো হাততালি দিয়াও দিতে পারে। ভয়ে ভয়ে থাকি আর ভাবি যে কি করতে পারি আমি?

নাহয় টুইস্ট করার লাইগা এইখানে ওই ছবিটা দিলাম যেইখানে মদের বোতল হাত নিয়া একটা ছেলে চলে যাইতে চাইতেছে আর মেয়েটা তার পায়ে ধইরা

রাখতেছে। ছবিটাতে লেখা থাকবে, পৃথিবীর প্রথমদিনে আমি তোমার ছিলাম, শেষদিনেও আমি তোমারই থাকবো! কিশোর বয়সে কোন এক সেলুনে দেখা এই ছবি। সেইটাও কোন সান্ত্বনা দিতে পারতেছে না। হিউমারও করা যাইতেছে না কোন।

এইটা হাম দিল দে চুকে সানম এর অজয় দেবগনও না যে রিয়েল লাইফে কাজোল'রে বিয়া করতে পারে। বা এমন না যে নীলা তখন দৌড় মাইরা ফেরত আসবে! অথবা আমাদের মাহমুদ স্যার যেইরকম, বিয়ার পরের দিনই লঞ্চে কইরা গিয়া তাঁর নতুন বউরে প্রেমিকের কাছে ফেরত দিয়া আসছিলেন। কেউ কোনদিন আসেই নাই আমার কাছে, আমি কি পাইছি যে ফেরত দেয়ার কথা ভাবতে পারবো। আমি বরং বউটার কথা ভাবি। বউটা কি বুঝতেছিলো তখন কি জিনিস শে পাইতে গিয়াও পায় নাই? আসলে শে তো পাইতেও পারতো না, থাইকা গেলেও। কিন্তু মাহমুদ স্যার তো একরকম উদাস হইতে পারছিলেন যে, পাইলেও না-পাওয়াই থাকে আর এই না-পাওয়া ভিতর দিয়া একটু যে পাওয়া হইলো সেইটা হইলেই বেটার আসলে।

আমি জানি রিয়ালিটি থিকা বাইর হয়া আসার একটাই উপায়, সেইটা হইলো তারে ইগনোর করা। আমি শালার মোস্তাফিজ'রে কইলাম, আপনি কি যাবেন আমার সাথে? বা মনেহয় জিগাইলামই না। ওর বাসা তো আমার বাসার কাছেই, আমার গাড়িতে লিফট নেয়ার কথা। কিন্তু মোস্তাফিজের সাথে যদি রিয়ালিটিও চইলা আসে? আমি ডরাইতেছিলাম। এই কারণে ওরে ছাড়াই আমি চইলা আসছি।

কি করবো আমি? যেই ঘটনা ঘটার সেইটা তো ঘইটা গেছে। আমি ঘটনার কাছ থিকা পালাইয়া আসতে পারি কিন্তু তারাও তো ঘটতেই থাকে। ঘটতেই থাকবে। আমি কেমনে তার ফ্লো'রে ইগনোর করবো। হয়তো তারা একটা উইক একসাথে কাটাইয়া যার যার লাইফে ফিরা যাবে। হয়তো তারা জীবনেও আর দেখা করবে না বইলা সারাজীবন একসাথে থাইকা যাবে। সব সম্ভাবনাগুলা তো ঘটতে পারে না। সব সম্ভাবনাগুলাই আসলে তারপরও আমাদেরই জীবনে থাইকা যাবে। কি যে করি আমি! কি যে করি!

গাড়ির পিছনের সিটে বইসা ফোঁপাইতেছি শুধু, চোখ দিয়া কোন পানি বাইর হইতেছে না। আমি গাড়িতে উইঠাও বুঝতে পারতেছি না আমি কি মুস্তাফিজের জন্য ওয়েট করবো নাকি চইলা যাবো? আমি কি ওরে বলছিলাম গাড়িতে আসতে নাকি বলি-ই নাই কিছু? নিজেরে সামলানোর লাইগা বইসা আছি। ভাবতেছি, কেন আমারে এই সিন দেখতে হইলো! দেখতেই হইতেছে বারবার। খালি ওই জায়গাটাই রিউইন্ড হইতেছে আমার চোখের সামনে।

আমি নাহয় সাহিত্যের ভাষাতেই কইলাম নীলা'রে, ফিরে এসো! ফিরবা না তো তুমি, যদি বালের জীবনানন্দের তবু বলি, তারপরও ফিরবা না তুমি! তোমার ভালোবাসা তোমার মেমোরি'র ভিতর আটকাইয়া আছে। বারবার রিউইন্ড হইতেছে। প্রত্যেকবার তারা নিজেদেরকে প্রুভ করতেছে, আমরা খালি ছিলাম-ই না কোন অতীত হয়া; আমরা আছি আর থাইকা-ই যাইতেছি। আমারে দেইখা নীলা

বলতেছে, তুমি বাল একটা ভিউয়ার, দৃশ্যের বাইরের একটা অস্তিত্ব। আমি বুঝতে পারি, আমি আসলেই ছিলাম না কখনো। একটা না-থাকা কি কইরা ফিরা আসতে পারে আরেকটা না-থাকার কাছে? তারপরও নীলা থাকার ট্রাই করতে থাকে; আমি যে বুঝতে পারতেছি এইটা বুঝতে পারার পরেও।

খামাখাই তুমি ভাবো যে, তুমি নিজ'রে নিয়া আছো। তুমি তো নাই। ছিলাও না। একটা ইমাজিনেশনের ভিতরে তুমি আমারে বাইন্ধা রাখতে চাও। যে কখনো ছিল-ই না, সে কেমনে ফিরা আসে! যে নাই সে তো নাই-ই। ঘটনাটা কখনোই এইরকম না যে, কেউ একজন ছিলো, কিন্তু এখন নাই। কেউ ছিলোই না কোনদিন। যার ফলে যা কিছু আছে বইলা ভাবতে পারতেছিলাম আমি সেইসবকিছ্ও বাতিল হয়া যাইতেছে। 'আমি' বইলা যে না-থাকাটা সে থাকতে পারতেছে না আর। কিন্তু এই না-থাকা যাইতেছেও না; মনে করতেছে কেউ একজন আসবে, আইসা বাঁচাইয়া ফেলবে; অথচ একইসাথে এইটা ঘটতে যে পারবে না এইটাও সে জাইনা ফেলছে আর জানাটারে অমিট করতে পারতেছে না। একটা না-থাকার ভিতরই সবকিছু আইসা আটকাইয়া যাইতেছে। তারপরও খালি কান্দা আসতেছে, বলতেই আছে কেউ, আজাইরাই, ফিরে এসো!

জুন, ২০১৫

ইমরুল হাসান। জন্ম: ১৯৭৫।

কবিতার বই:

ঋতুচিহ্নগুলি (১৯৯৮)।

কালিকাপ্রসাদে গেলে আমি যা যা দেখতে পাবো (২০০৫)।

অশ্বত্থ বটের কাছে এসে (২০১০)।

তোমার কথাগুলি আমি অনুবাদ করে দিতে চাই (২০১১)।

রাঙামাটি (২০১২)।

বসন্ত ১৪১৯ (২০১৩)।

স্বপ্নের ভিতর (২০১৪)।

টেস্ট এনভায়রনমেন্ট (২০১৬)

Filename: purir golpo.docx
Directory: C:\Users\rkmanu\Documents
Template: C:\Users\rkmanu\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: rkmanu
Keywords:
Comments:
Creation Date: 6/26/2016 11:15:00 PM
Change Number: 41
Last Saved On: 2/17/2017 11:34:00 AM
Last Saved By: rkmanu
Total Editing Time: 2,837 Minutes
Last Printed On: 2/17/2017 11:37:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 182
Number of Words: 24,964 (approx.)
Number of Characters: 142,296 (approx.)